গৃহকপোতী

॥ নবতন সংস্করণ ॥

॥ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ।

॥ প্রচ্ছদ ॥

মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্ঞানোদয় প্রেস (১২, মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত ॥

সুনীতিপ্রভা ঘোষ

শ্রীজানকীজীবন ঘোষ

করকমলেষু—

বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' এবং 'সোমলতা' এই ট্রিলজিই সরোজকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও এই উপন্যাস তিনখানি যে সরোজকুমারের সার্থক সৃষ্টি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার ধর্মভিত্তিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিলুপ্তপ্রায় 'বাউল-সম্প্রদায়ে'র যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।

মুশকিল হয়েছে, এই তিনখানি উপন্যাস যে একটি বিরাট উপন্যাসের তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড, এ তথ্য না জানায় অনেক পাঠকের পক্ষেই এই অপূর্ব গ্রন্থের পরিপূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব হয়নি। 'ময়ূরাক্ষী' এর প্রথম খণ্ড। এখানে নায়িকা বিনোদিনী পল্লীসমাজের ভালো মন্দ সমস্ত সংস্কার নিয়ে কাটালো তার গার্হস্থ্য জীবন। সুখে-দুঃখে, আশা-নিরাশায় ভরা অপূর্ব সে জীবন-কাব্য।

সেই জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল রসময়ের বাউলের আখড়ায়, যেখানে বন্ধন নেই, আছে শুধু অনন্ত মুক্তি। নারী সেখানে সেই পরম পুরুষের পূজার উপকরণ যিনি সকল রসের আশ্রয়। অনন্ত মুক্তির লঘুতম হাওয়া গৃহকপোতীর ডানায় যেন সাড়া জাগায় না। অত উঁচুতে ওড়া তো তার অভ্যাস নেই। তবু তাকে উড়তেই হয়। নিচে নামার উপায় কোথায়?

অবশেষে নিচে নামারও উপায় হল তার জীবনের তৃতীয় পর্বে। সুদূর উচ্চলোক থেকে যে সোমরস সে পান করে এল, পিতৃগৃহের পরিবেশে তা যেন তাকে নতুন করে, অপূর্ব করে সৃষ্টি করলে। 'সোমলতা'য় বিনোদিনী যেন এই পৃথিবী, কলঙ্কে ও মহিমায় তার আর তুলনা নেই।

সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর গ্রামখানি আকারে বড়। আসলে দু'টি একই গ্রাম। মধ্যে একটি পুল। পুলের এধার সাতগাঁ, ওধার কাঞ্চনপুর। এইটুকুমাত্র ব্যবধানে পৃথক গ্রাম হওয়ার কথা নয়। পার্থক্য গ্রাম দু'টি পৃথক জমিদারের অধীন ব'লে। সাতগাঁর জমিদার সিংহ গোষ্ঠী, কাঞ্চনপুরের মল্লিকবাবুরা। সাতগাঁয়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের সংখ্যাই বেশী। অন্যান্য জাতি দু'চার ঘর ক'রে। কাঞ্চনপুরে সদ্‌গোপের সংখ্যাই অধিক। অন্য জাতির সংখ্যা কম। পশ্চিম প্রান্তে ময়ূরাক্ষী। তার ধারে অনেকখানি জায়গা নিয়ে উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়, তার ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ ইত্যাদি। তারই অদূরে একটা আমবাগানের মধ্যে রসময়ের আখড়া। একেবারে নদীর উপরে বললেই হয়।

আমবাগানের মধ্যেখানে কাঠাখানেক জায়গা রসময় বাঘ-ভেরেণ্ডার বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। তার মধ্যে একখানি দু'চালা দক্ষিণদ্বারী ঘর। তাতে দু'খানি মাত্র কুঠরি। দাওয়া একটা মানুষের বুকসমান উঁচু। আর একপাশে রান্নাঘর। রান্নাঘরের মধ্যে একটি চাতাল আর দু'পাশে দু'টি ছোট ছোট কুঠরি। উঠানটি ঝকঝকে তকতকে। যেন সিন্দুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। তারই এক কোণে একটি তুলসীমঞ্চ।

•

বিনোদিনী এখানে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে তাকে দক্ষিণদ্বারী একখানি ঘর শোবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর রান্নাঘরের একটি কুঠরি। চাতালের দুই কোণে দু'টি উনান পাতা। একটি

তার, একটি ললিতার। বিনোদিনী আসার পর থেকে আর একটি চালা বেড়েছে। সেটি বিনোদিনীর ঢেঁকিশাল। বিনোদিনী রসময়ের পোষ্য সংখ্যা বাড়ায়নি। ভদ্র গৃহস্থের বাড়ি থেকে সে ধান নিয়ে আসে। সেই ধান ভেনে নিজের প্রাপ্য কেটে রেখে বাকি যার ধান তাকে দিয়ে আসে। এইভাবে তার গ্রাসাচ্ছাদন হয়, কিছু বাঁচেও। একটা পেট বৈ তো নয়। বিনোদিনীর আশা আছে, বৎসরখানেকের মধ্যে এই ক'রে সে কিছু জমাতেও পারবে। জমান উচিতও। মানুষের সময়-অসময়, আপদ-বিপদ আছে। গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের বউ,—সঞ্চয়ের বীজ তার রক্তের মধ্যে আছে।

কিন্তু রসময় যেন তাতে মনে মনে বিরক্ত হয়। এ তার গৃহ নয়, আখড়া। সে নিজেও গৃহী নয়, বাউল সন্ন্যাসী। সঞ্চয় তার ধর্মবিরুদ্ধ। তার আখড়ায় বিনোদিনী ধীরে ধীরে যেন গৃহের আবহাওয়া আনছে,—শুধু ধান ভেনে আর সঞ্চয় করেই নয়, বহু মানুষের সঙ্গে দৈনন্দিন কারবারে লিপ্ত হয়ে। নদীর এদিকটায় আগে কেউ বড় একটা আসত না। এক আসত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফুল তুলতে, পেয়ারা পাড়তে আর নিরিবিলি খেলাপাতির ঘর বাঁধতে। আর আসত ···

কিন্তু তাদের কথা থাক। মধুর লোভে মৌমাছি এসে জোটেই। ললিতা থাকলে আখড়ার আনাচে-কানাচে এমনি দু'চারজনের গতিবিধিও থাকবেই। রসময় তাদের গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু বিনোদিনী যেদিন থেকে ঢেঁকিশালে ঢেঁকি পেতেছে সেদিন থেকে হরেক রকম মানুষের আসা-যাওয়ার আর বিরাম নেই। কেউ ধান ভানতে দিতে চায়, কেউ চাল কিনতে চায়। কোনো গৃহস্থ-বধূ পরিজনের অসাক্ষাতে দু'টি চাল এনেছে, স্বল্পমূল্যে বিক্রি ক'রে যেতে চায়। কারও চাল দিতে বিনোদিনীর দেরি হয়েছে, সে এসে চীৎকার করছে। কেউ ধারে চাল নিয়ে গেছে, নির্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত, তবু দাম মেটায়নি, আবার ধারে চাল নিতে এসেছে; বিনোদিনী তার

আক্কেল সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে। কারও সঙ্গে বাধছে চালের দর নিয়ে কলহ, কারও সঙ্গে ওজন নিয়ে। দিবারাত্রি এই হট্টগোল রসময় পছন্দ করে না। কিন্তু মুখে কিছু বলতেও পারে না। মুখের সামনে কাউকে রূঢ় কথা বলা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বলে,—কখনও আকারে ইঙ্গিতে, কখনও পরিহাস ক'রে, আবার কখনও বা নেচে গেয়ে।

কিন্তু বিনোদিনী তা গায়ে মাখে না। এক একজন লোক থাকে যাদের উপর অত্যাচার করতে কারও ক্লেশ বোধ হয় না। রসময় সেই ধরনের লোক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে অকুণ্ঠিত চিত্তে তার ঘর-দোর ভাঙছে, অপরিষ্কার করছে। স্কুলের ছেলেরা স্কুল পালিয়ে এসে তার দাওয়ায় ব'সে নিঃশঙ্কচিত্তে তাস পিটছে, আর তারই তামাকের শ্রাদ্ধ করছে। রসময় হাসিমুখে এই উপদ্রব সহ্য করে। ছেলেরাও তার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় না। অবশ্য এই সমস্ত ছোট ছেলেরা ছাড়া আর কেউ কোনো উপদ্রব করে না। তারা এদিকে বড় একটা আসেই না। এমন কি রসময় ব'লে যে একজন এদিকে বাস করছে তাই সব সময় খেয়াল থাকে না। তাদের সঙ্গে ওর কারবারই নেই। নতুন কারবার আরম্ভ হ'ল বিনোদিনীর সঙ্গে। সেও যেন ছেলেদের ছোঁয়াচ পেয়েছে। রসময়ের উপর অত্যাচার করতে তারও লজ্জা বোধ হয় না।

বিনোদিনী প্রথম যেদিন তার আখড়ায় এসে উঠল, অন্য যে কেউ হ'লে তার আরক্ত মুখ, আলুথালু বেশ দেখে বিস্মিত হ'ত। কিন্তু ললিতা এবং রসময় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী লোক। ওরা বিনোদিনীকে দেখামাত্র এত খুশী হয়ে উঠল যে, বিস্মিত হওয়ার ফুরসতই পেলে না। বিনোদিনীকে নিয়ে প্রথম দু'টো দিন কী ক'রবে, কোথায় রাখবে, কী খাওয়াবে সেই আনন্দেই কাটিয়ে দিলে। তার পরে খেয়াল হ'ল কিছু-একটা নিশ্চয় হয়েছে। নইলে গৃহস্থ ঘরের বধূ একটা বাউলের আখড়ায় এসে আশ্রয় নিতে পারে না। কিন্তু দু'জনের কেউই এ কথা সঙ্কোচে বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। অনুমান করলে,

হারাণের সঙ্গে একটা কলহ হয়ে থাকবে। দাম্পত্য কলহ, যত জোরই হোক, দু'দিন পরেই হারাণকে ঘাড় হেঁট ক'রে এসে বিনোদিনীকে নিয়ে যেতে হবে। হারাণের পরিচয় এবার ওরা ভালো ক'রেই পেয়ে এসেছে। তার বাইরেটা যত কর্কশ এবং যত কঠোরই হোক, ভিতরটা দো-মালা নারকেলের মতো নরম এবং সরস। বিশেষ বিনোদিনীকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না। দু'জনে ঝগড়াও যত, ভাবও তত। তার উপর ছেলেমেয়ে দু'টি রয়েছে। হারাণ যদি বা দু'দিন থাকতে পারে, হাবল-মেনী থাকতে দেবে না। হারাণের দুরবস্থা ভেবে রসময় এবং ললিতা প্রাণ খুলে হাসলে।

কিন্তু দু'দিন গেল, চার দিন গেল, একটা সপ্তাহ কেটে গেল, তবু হারাণের দেখা পাওয়া গেল না। বিনোদিনীকেও সেজন্যে মনে মনে ব্যাকুল হ'তে দেখা গেল না। বরং আসার দিনকয়েক পরেই সে পাড়া প্রতিবেশিনীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে ধানভানা ব্যবসার বনিয়াদ পোক্ত করতে লাগল। যেন এখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যেই এসেছে। ললিতা এবং রসময় দিনকয়েক বিনোদিনীর সম্বন্ধে চিন্তা করলে। তার পরে এসব কথা ভুলেই গেল। ভুলে গেল, বিনোদিনী তাদের কেউ নয়, সে এখানে আগন্তুক মাত্র। তাকে ওরা অল্পদিনের ভিতরেই অন্তরঙ্গ ক'রে নিলে। আর পরকে আপনার করবার তাদের যে অসামান্য শক্তি আছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

কিছু চিন্তিত হ'ল প্রতিবেশিনীরা। বিনোদিনী কে, কোথায় বাড়ি, কেন এসেছে, গৃহস্থের বধূ স্বামীর ঘর ছেড়ে কি কারণে বাউলের আখড়ায় এল, এ নিয়ে তাদের গবেষণা উদ্দাম হয়ে উঠল। পুঞ্জীভূত হ'ল অনুমানের পর অনুমানের স্তূপ। বহু চেষ্টাতেও তার সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানতে পারলে না। রসময় এবং ললিতাকে প্রশ্ন করলে তারা পাশ কাটিয়ে স'রে যায়। সত্যি সত্যি তারা কিছু জানেও না। বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করলে সে ম্লানভাবে শুধু একটুখানি হাসে। আলাপ-আলোচনায় হাসিতে-গল্পে বিনোদিনী সকলের মনোহরণ

করলে। তাতে কৌতূহল মিটল না বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে ম'রে গেল। বিনোদিনী আস্তে আস্তে তাদের সঙ্গে মিশে গেল। কারও সঙ্গে পাতালে গোলাপফুল, কারও সঙ্গে বানজল, কারও সঙ্গে সই।

চঞ্চলতা মিটল না কেবল ক'টি ছোকরার, আর সিংহবাবুদের বৃদ্ধ নায়েব কালীশঙ্করের। ছোকরা ক'টির কথা ছেড়ে দিলাম। তাদের উঠতি বয়স। যাত্রার দলে গান-বাজনা-বক্তৃতা ক'রে, দু'পাঁচ রকমের নেশাভাঙ ক'রে এবং তাস-পাশা-দাবা খেলেও লোকের বাড়ির আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ বাকি থাকে। কিন্তু কালীশঙ্করের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। মাথার চুল গেছে পেকে এবং দাঁত গেছে প'ড়ে। এবং বোধ হয় নায়েবি-কাজে বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিরিক্ত পরিচালিত করার ফলে মুখমণ্ডলে এত বেশী রেখা প'ড়েছে যে, দেখলে আরও দশ বছর বয়স বেশী লাগে। গাল ভেঙে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়েছে, হাতের শিরাগুলো বেরিয়ে গেছে,—সবই গেছে, যায়নি শুধু প্রবৃত্তি। নদীর দিকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন বিনোদিনী তার চোখে প'ড়ে গেল। ভিজে কাপড়ে সে তখন জল নিয়ে নদী থেকে ফিরছে।

কালীশঙ্কর থমকে দাঁড়াল। তার প্রবৃত্তি তখন উন্মার্গে ছুটেছে। সে সঙ্গের পাইকের দিকে ইঙ্গিতে চাইলে।

পাইক মনিবকে চেনে। নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে। বললে, আন্‌কা বোধ হচ্ছে।

কালীশঙ্কর একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বললে, হুঁ।

বিনোদিনী আপনার মনে জল নিয়ে বেড়া ঠেলে আখড়ার মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে পাইক বেড়াচ্ছে, হয়তো কোনো অর্থশালী লোক ভেবে বেড়া বন্ধ করবার সময় একবার মুখ ফিরিয়ে আধঘোমটার ফাঁকে কালীশঙ্করের দিকে চাইলে।

কালীশঙ্কর একদৃষ্টে বিনোদিনীর দিকেই চেয়ে ছিল। ও যে কোথায় থাকে সে সন্ধান পাওয়া গেল। পেয়ে একটু আশ্বস্তও হ'ল।

আর যাই হোক, মেয়েটি গৃহস্থ ঘরের বৌ-ঝি নয়। সুতরাং খুব দুষ্প্রাপ্য হবে না। সে আর একবার ইঙ্গিতে পাইকের দিকে চাইলে। পাইকও নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে মনিবকে আশ্বাস দিলে।

কালীশঙ্কর বললে, ধান তাহ'লে এবার মন্দ হবে না। কি বলিস ?

—আজ্ঞে হুজুর, ধান এবার বিপরীত হয়েছে।

বিপরীত এখানে প্রচুর অর্থে ব্যবহৃত হ'ল।

—তবে আউশের···

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আউশের···

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কালীশঙ্কর কদাচ পাইকের সঙ্গে নারী সম্পর্কে আলোচনা করে না। এ বিষয়ে কখনও কোনো স্পষ্ট আদেশও দেয় না। ধান সম্বন্ধে যে আলোচনা হ'ল উভয়েই বুঝলে তা নিতান্তই বাহ্য। গুহ্য কথা উহ্যই রইল। বাকি পথটুকু পাইক রামশরণ তার ভাবী কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে গেল।

এদের সংসারে এসে বিনোদিনী একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে : এতদিন সে এসেছে, এর মধ্যে একটা দিনও রসময় আর ললিতার মধ্যে কলহ হয়নি। একটা মুহূর্তের জন্যে কাউকে মুখ ভার করতে দেখেনি। এ বাড়িতে কেউ জোরে কথা পর্যন্ত কয় না। উচ্চ ধ্বনির মধ্যে ললিতার হাসি আর রসময়ের গান, নয় তো রসময়ের হাসি আর ললিতার গান। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যত ভাবই থাক, কখনও না কখনও কলহ হয়ই। অন্ততঃ অভিমানেও কখনও না কখনও এক পক্ষ মুখভার করে। বিনোদিনী আশ্চর্য হ'ল, বৃষ্টি দূরের কথা কারও মুখে একটুকরো মেঘ পর্যন্ত কখনও ছায়া ফেলে না।

ওরা ওঠে এক প্রহর রাত থাকতে। স্নান সেরে আসে যখন, তখন সবে সূর্য উঠছে। তার পর দ্বার বন্ধ ক'রে ভজন-সাধন কি করে, তা বিনোদিনীর অজ্ঞাত। সে শুধু দেখেছে ওরা একাসনে বসে, এক

থালায় খায়, আর সন্ধ্যার সময় বেদী বাঁধান নিমগাছের তলায় একজন যখন একতারা বাজিয়ে গান গায়, অপরজন তখন পাশে ব'সে দুলে দুলে ডুবকি বাজায়।

ওদের দু'জনে কোনোদিন একটা সাংসারিক কথাবার্তাও হয় না। রসময় প্রভাতী ভজন-সাধন সেরে ভিক্ষায় বেরোয়। ভিক্ষায় যা পাওয়া যায় ললিতা তাই ফুটিয়ে দেয়। একদিন ললিতা বললে না, ঘরে চাল বাড়ন্ত। রসময়ও একদিন বললে না, এ রান্না অখাদ্য হয়েছে, মানুষে কি এ খেতে পারে? ওদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা হয় এই রকম ভাবে:

নিমগাছে ঠেস দিয়ে রসময় হয়তো গাইলে:

কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর।

ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দিয়ে ললিতা অমনি গেয়ে উঠল:

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

সঙ্গে সঙ্গে ভারি গলায় রসময় এবং লহরে লহরে ললিতা এমন ক'রে হেসে উঠল যে কি যেন একটা আনন্দে বিনোদিনীর সমস্ত দেহ কদম্বের মতো শিউরে উঠল। ওরা যেন এই সংসারকে নিতান্তই একটা খেলাঘর মনে করেছে। একটা শিশুও জীবন সম্বন্ধে ওদের চেয়ে গম্ভীর।

এত হালকা হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া বিনোদিনীর অভ্যাস নেই। সে হাঁফিয়ে ওঠে। এও যেন মানুষের সহজ জীবনযাত্রা নয়। মানুষের স্বাভাবিক জীবনে হাসি আছে, কান্নাও আছে; মিলন আছে, কলহও আছে। তা নয়, সর্বক্ষণই হাসি, সর্বক্ষণই গান?

বিনোদিনী ধমক দেয়, ও কি ললিতা! সব্ সময়ই হাসতে গাইতে তোর ভালো লাগে?

ললিতা আরও হাসে। বলে, মরণ আর কি! হাসব না তো কি কাঁদব? কেন, কি দুঃখে কাঁদব, শুনি?

বিনোদিনী অবাক হয়। কি দুঃখে কাঁদবে? কেন, মানুষের জীবনে দুঃখের কখনও অপ্রতুল হয় নাকি? বলে, সাংসারিক দুঃখ না হয় নেই। তোরা না হয় সংসারই পাতিসনি। কিন্তু দু'টো মানুষ এক ঠাঁই হ'লে সুখ যেমন আসে, দুঃখও তেমনি আসে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাব হলেই হ'ল! তার সঙ্গে সন্দেহ আসবে না, হিংসে আসবে না!

ললিতা নাক সিঁটকে বলে, আসেনি তো কই!

বিস্ময়ে বিনোদিনী গালে হাত দেয়।

জবাব আসে রসময়ের কাছ থেকে। বলে, বিনোদিদি, বাঁধলেই বাঁধা পড়ে। আমরা কেউ কাউকে বাঁধিনি, তাই নিজেও বাঁধা পড়িনি। আমরা নিজেদের সন্দেহ-অবিশ্বাস করি না, তাই অন্যের ওপরও সন্দেহ-অবিশ্বাস হয় না। আর হিংসের কথা বলছ? পরকে হিংসে করব আমাদের কি এমনই দুর্বল ভেবেছ?

—কি জানি ভাই! —বিনোদিনী বললে।

রসময় হেসে বললে, এই তো সবে এলে, এরই মধ্যে জানবে কি ক'রে? আরও দু'দিন থাক, দেখবে এ ক্ষ্যাপা বাউলের খোলা মাঠ। এখানে যার যা খুশি সে তাই করবে। মুখে দূরে থাক, মনে মনেও কেউ তা নিয়ে নালিশ করতে পাবে না।

বিনোদিনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, মনে মনেও নালিশ করতে পাবে না?

—মনে মনেও না। কিসের নালিশ করবে? কেউ কি কারও ধার ধারে? যার যা খুশি সে তাই করবে। নালিশ করবেন রাধারানী, বিচার করবেনও তিনি। তুমি আমি কে?

রসময় হা হা ক'রে হেসে উঠল।

একটু ভেবে বিনোদিনী বললে, এত ছাড়াও ভালো নয়।

ললিতা জবাব দিলে, যার নয় তার নয়। আমাদের এই ভালো।

হো হো ক'রে হেসে রসময় বললে, ঠিক বলেছ! বলে, 'যার কর্ম তারে সাজে, অন্যকে তার লাঠি বাজে।' তা বিনোদিনী পারবে। দিদি আমার নিরিবিলি মানুষ।

এমন সময় সুদাম এল।

ললিতা সুর ক'রে বললে, এস এস, সুদাম সখা এস। গোষ্ঠের সব কুশল তো?

সুদাম একটু মুচকি হেসে যেখানে তামাক-টিকের সরঞ্জাম থাকে সেখানে গিয়ে বসল। সুদাম থার্ড ক্লাসে পড়ে। হস্টেলে থাকে। বয়স হয়েছে, পড়াশুনো আর ভালো লাগে না। কিন্তু বাপ শোনেন না। জোর ক'রে পড়তে পাঠিয়েছেন। হস্টেলে তামাক খাওয়ার সুবিধা নেই। অনেকবার বিড়ি খেয়ে খেয়ে এখন একবার তামাক খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। তামাকের তৃষ্ণা কি বিড়িতে মেটে? তাই এসেছে এতদূর।

ললিতা ওকে সুদাম সখা বলে। সুদাম দেখতে লম্বা চওড়া। ওর ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে ওকে মোটে মানায় না। পুরু ঠোঁট, থ্যাবড়া নাক, ছোট্ট কপাল। চোখ দু'টো ড্যাবড়া ড্যাবড়া, তাতে এতটুকু তীক্ষ্ণতা নেই। দাঁতগুলো গরুর দাঁতের মতো, সব প্রায় এক মাপের। পরিপাটি কেবল চুলগুলো। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে সিঁথিটি একমুহূর্তের জন্যে বিশৃঙ্খল হয় না।

সুদাম তামাক সেজে একটুখানি আগুনের জন্যে ললিতার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বিনোদিনী গায়ের মাথার কাপড় ভালো ক'রে টেনে পিছন ফিরে বসল। সুদাম এবং অন্যান্য ছেলের এত ঘনিষ্ঠতা বিনোদিনী পছন্দ করে না। মুখে কিছু বলতে পারে না, এই ভাবে মনের বিরক্তি প্রকাশ করে।

ললিতা একটা পোড়া ঘুঁটে উনান থেকে বের ক'রে দিলে। হেসে বললে, একটুখানি তামাকের জন্যে সুদাম সখার প্রাণটা আইঢাই করে। মাঝে মাঝে গোষ্ঠ থেকে ছুটে আসে।

—সে তামাকের জন্যে, না ললিতাসখীর জন্যে, কে জানে? কি বল সুদাম সখা! —রসময় বললে।

বিনোদিনীর দিকে অপাঙ্গে চেয়ে সুদাম বললে, যাঃ!

ললিতা ফিরে বসল। মাথার আধঘোমটা খুলে কবরীতে এসে আটকে গেছে। চোখের তারা নাচিয়ে ললিতা বললে, যাঃ বললে শুনছি না সুদাম সখা। বলতে হবে তামাকের জন্যে, না আমার জন্যে। নইলে আগুন দিচ্ছি না।

—তোমার জন্যে, তোমার জন্যে। সুদাম বললে।

রসময় হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সুদাম তাড়াতাড়ি আগুনটা টেনে নিয়ে বললে, না না, তামাকের জন্যে।

এবার ললিতা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বিনোদিনী আর সইতে না পেরে চাপা কণ্ঠে ধমক দিলে, আঃ, কি করিস?

শুনে ললিতা আরও জোরে হেসে উঠল। বিনোদিনী ক্ষান্ত হ'ল।

সুদাম এসে নিমতলার বেদীতে উবু হয়ে ব'সে শোঁ শোঁ হুঁকো টানতে লাগল।

রসময় হেসে জিজ্ঞাসা করলে, অনেকক্ষণ খাওনি বুঝি?

—সেই কাল সন্ধ্যের সময় খেয়ে গিয়েছিলাম। তা, খেয়ে সুখ হয়নি। রাধিকে যখন হুঁকো দিলে তখন আগুন ঠিকরেয় ঠেকেছে।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, তাই বুঝি আজ আর রাধারানীকে সঙ্গে আননি? আহা, তামাকের শোকে সে বেচারার পেট ফুলে ঢোল হয়েছে বোধ হয়।

রাধিকা বছর চৌদ্দ-পনেরোর একটি ফুটফুটে ছেলে। সুদামের সঙ্গে পড়ে এবং তারই পাল্লায় প'ড়ে অকালে পাকছে। কথায় বার্তায় আকারে প্রকারে সুদাম যেমনি বোকা, রাধিকা আবার তেমনি চালাক। তার চোখ সর্বক্ষণের জন্যে ছটফট করছে, আর মুখে খই ফুটছে।

জামা-কাপড়, বিড়ি-সিগারেটের খরচার অর্ধেক সে সুদামের ঘাড় ভেঙে আদায় করে।

রসময় জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ কিছু হচ্ছে হে ?

—দাঁড়াও, পাস-টাস করি।

—তাই কর। কিছু না হয় খানিক এপাশ-ওপাশও কর।

সুদাম চ'টে গেল। বললে, তুমি তাই মনে করেছ বুঝি ? দাঁড়াও না, একবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠি। তারপর দেখবে হাসতে হাসতে পাস ক'রে যাব। এখনও সময় আছে অনেক। তাই তেমন চাড় করি না। দু'বছর পরে কি আর তাই করব !

—তা বটে।

রসময় চুপ ক'রে রইল। সুদাম নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগল ! একটু পরে রসময় উঠে ব'সে ভণিতা করলে, সেদিন তোমাদের ইস্কুলের নানা কথা হচ্ছিল।

—কি কথা ?

—এই আমার আখড়া তোমাদের তামাক খাওয়ার আড্ডা হয়েছে, আমি তোমাদের বখাচ্ছি ···

সুদাম লাফিয়ে উঠল। একটা হাত সম্মুখে প্রসারিত ক'রে বললে, কোন হারামজাদা বলে ?

ললিতা সভয়ে বললে, হ্যাঁ। তাদের নাম ক'রে দাও, আর ও গিয়ে একদিন অন্ধকারে তাদের মাথায় লাঠি মেরে আসুক, নয় তো গাছের ডাবগুলো সব পেড়ে নিয়ে আসুক। সুদাম সখার গুণে তো ঘাট নেই। খবরদার নাম ব'ল না।

রসময় তাতে থামল না। বললে, নাম শুনে আর কি করবে ? এই তোমাদের হেডমাস্টারই বলছিলেন। অন্যান্য মাস্টারও···

সুদাম দাঁড়িয়ে ছিল, হেডমাস্টারের নাম শুনে কথা না ব'লে বসল।

এমন সময় রাধিকা এল। একটা তর্জনী তুলে সুদামকে বললে, এই ! তোমাকে হেডমাস্টার ডাকছেন।

সুদামের মুখ শুকিয়ে গেল। হাত থেকে হুঁকো গেল প'ড়ে। ভয়ে হতচকিত হয়ে বললে, কোন হেডমাস্টার? কোথায়?

রাধিকা আস্তে আস্তে হুঁকোটা তুলে নিলে। ছু'টো টান দিয়ে নির্বিকারভাবে বললে, দেখ, ওইখানেই আছেন কোথাও।

সুদাম বুঝতে পারল না। কিন্তু ললিতা হেসে উঠল। তখন আশ্বস্ত হয়ে হাসতে হাসতে সুদাম বললে, এমন ভয় ধরিয়ে দেয়! ওই জন্যেই তো তোকে নিয়ে কোথাও যাই না। কোন দিন রাগের মাথায় দোব এক চড় বসিয়ে, সেইদিন বুঝবি।

ললিতা বললে, খুব বীরপুরুষ!

রাধিকা বললে, আমাকে তো এক চড় বসিয়ে দেবে। কিন্তু সকাল বেলায় যে তামাক খেতে এসেছ, হিস্ট্রির পড়া তৈরী হয়েছে?

ঠোঁট বেঁকিয়ে সুদাম বললে, ওঃ! হিস্ট্রির ভয় আর করি না। গিয়ে বই খুললে তিন মিনিটে মুখস্থ হয়ে যাবে। এ তোদের মতো পান্তা ভাত খাওয়া মাথা নয়, বুঝলি? রীতিমত দুধ-ঘি খাওয়া।

রাধিকা শুধু একটু হাসলে। সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও।

তা দেখে সুদাম রেগে বললে, হাসি আবার কি! হিস্ট্রি প'ড়ে সব হবে! তার চেয়ে তুমি একখানা গান গাও মোহান্ত। এই ছোঁড়া আমার শনি হয়েছে। সকাল বেলায় টিসটিস ক'রে মেজাজটাই দিলে খারাপ ক'রে।

গানে রসময়ের কখনই আপত্তি নেই। তখনই বিনা একতারাতেই গান ধরলে:

ধন্য কারিকর!
কে বানালে এমন ঘর,
ধন্য কারিকর!
তার কারিকরির বলিহারী গো,
সে মিস্তিরীর কোথায় ঘর?

ঘরের মূল তিনটি খুঁটি
ঘর বেশ পরিপাটি,
বাঁধন ছাদন দড়ি দড়া
সাড়ে তিন কোটি।
মাপতে হদ্দ চৌদ্দ পোয়া
আছে চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর।

ঘর বেশ আঁটা সোটা
সে ঘর ছ' তালা কোঠা।
তার উপরে আর একতালা
নাম মণিকোঠা।
তাতে দিবানিশি মণি জ্বলে
কর্তা থাকেন তার ভিতর।

ঘরের দরজা নয়খান,
তার দেখ প্রমাণ,
অসংখ্য জানালা আছে
কে করে সন্ধান।
তার ধারে ধারে ফুলের বাগান
মধ্যে আছে সরোবর।

সুদাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিঃশব্দে গানটা শেষ পর্যন্ত শুনলে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ও সব হিস্ট্রি-মিস্ট্রি আমার হবে না রে, জানলি রাধিকে। মোহান্তর কাছে গান আমাকে শিখতেই হবে।

ললিতা খিলখিল ক'রে হেসে বললে, সুদাম সখা এইবার সার ভেবেছে। আর ভাবনা নেই।

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে সুদাম বললে, নেই-ই তো। ওসব বিসয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা ভালো লাগে না। আমি দেখবি কোন দিন একটা আখড়া খুলে ব'সে গেছি। মাথায় বাবরি চুল, মুখে দাড়ি। সকাল বেলায় এমনি গাছতলায় ব'সে একতারা বাজিয়ে পরমানন্দে গান গাইছি।

সবাই হেসে উঠল। হাসলে না কেবল রসময়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুদামের মুখের দিকে চেয়ে সে যেন কি খুঁজলে। সুদামের কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা বৈরাগ্যের সুর ওর কানে এসে বাজল। আপন মনেই কি যেন ভেবে মাথাটা একবার নাড়লে।

॥ দুই ॥

এবারে কার্তিক মাসে পূজা। সাতগাঁ-কাঞ্চনপুরে মোট পাঁচ-ছ'খানা পূজা আসে। কয়েকখানার দু'মেটে হয়ে গেছে। কয়েকখানার এক মেটে মাত্র হয়েছে। বারোয়ারি প্রতিমাখানায় মাটি দেওয়া হচ্ছে। ওখানায় প্রতি বৎসর মাটি দেওয়া হয় রাধাষ্টমীর দিন। গৃহস্থ বাড়িতে বধূরা ঘর ঝাড়া-মোছা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ছেলেরা মাথায় ক'রে নদীর ধার থেকে রাঙা মাটি নিয়ে আসছে। মেয়েরা মইতে চড়ে দেওয়ালে সেই মাটি লেপছে। দরজায় জানালায় দিচ্ছে আলকাতরা। সর্বত্র তারই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পথে-ঘাটে-মাঠে আরও একটি চমৎকার গন্ধ শরতের সকালটিকে মনোরম ক'রে তুলেছে। সে গন্ধ শিশির-ভেজা ঘাসের, কি ঝরা শেফালির, কিংবা পরিপক্ক নোনা আতার, বলা কঠিন। সেই গন্ধ এনেছে আসন্ন পূজার আগমন সংবাদ। তারই আমেজ এসে পৌঁছেছে মানুষের মনে মনে। মনে অনতিপক্ক ফলের মতো রসের এবং রঙের আভাস জেগেছে।

আউশ ধান কাটা আরম্ভ হয়েছে। কয়েক বৎসর অজন্মার ফলে লোকের যে দুরবস্থা ঘটেছিল, আউশের কল্যাণে তার কিছুটা উপশম হয়েছে। আশা হয়েছে, এবার পূজা নিশ্চিন্ত আনন্দে কাটতে পারে। চালের জন্যে লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে হবে না।. এক বেলা দিব্য গরম গরম নতুন আউশ চালের ভাত আর কচু সিদ্ধ চলবে। গরুরও খড় হয়েছে। ক'দিন কি কষ্টই গেল! পয়সা দিয়েও চাল পাওয়া যায় না। ধারের তো কথাই নেই। আর গরুর খড় তো একেবারেই

দুষ্প্রাপ্য। গেলবারে ফসল যখন কম হ'ল, তখন লোকে অতি যত্নে সমস্ত খড় গরুর জন্যে তুলে রাখলে। ঘরের চাল ফুটো। তা দিয়ে অঝোরে জল পড়েছে। বৃষ্টিতে লোকে ছেলেমেয়ে নিয়ে একোণ ওকোণ ক'রে ভিজে জেগে কাটিয়েছে। তবু গরুর মুখ চেয়ে কেউ একটি আঁটি চালে তোলেনি। কিন্তু এততেও খড় কম পড়ল। চাষী গৃহস্থ নিজেই সমস্ত দিন মাঠের আলে আলে ঘুরে ঘাস কেটে এনে গরুকে খাওয়াতে লাগল। ভদ্রলোকে ঘাস কিনতে লাগল। এই একটা মাস এমনি কষ্টে গেছে। এতদিনে মানুষের কিছু সচ্ছলতা এল। আউশ উঠল। আউশ চালের ভাত দু' বেলা অবশ্য খাওয়া যাবে না। এক বেলা ক'রে খেলে আশ্বিন কার্তিক দু'টো মাস যাবে। অগ্রহায়ণের গোড়াতেই লঘু ধান উঠবে। তারপরে মোটা আমন। আর ভাবনা নেই। এবারে যা ফসল উঠবে তাতে সম্বৎসর চ'লে সবাই কিছু কিছু গোলায় বাঁধতে পারবে। বানে এদিকের সামান্যই ক্ষতি করেছে।

এই আনন্দেই গ্রামখানি মুখর হয়ে উঠেছে।

ছেলেরা স্কুলে চলেছে কলরব করতে করতে। পূজার ছুটির আর মাত্র সপ্তাহ তিনেক দেরি। পড়ায় এসেছে শৈথিল্য। বাঁশের চওড়া-চওড়া কাবারি দিয়ে তারা খাঁড়া তৈরি করেছে। সন্ধ্যার আরতির পরে ঢাক বাজিয়ে খাঁড়া নিয়ে পাড়ায় নাচতে বেরুবে। ও-পাড়ার ছেলেরা গেলবার এ-পাড়ায় নাচতে এসে কলাগাছ ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল। এবারে এ-পাড়ার ছেলেরা তার শোধ তোলবার জন্যেই তৈরী হচ্ছে। আর কোন প্রতিমা বড়, কোন প্রতিমা ছোট, কার সিংহ কেমন, কার্তিকের পোশাক কাদের ভালো কাদের মন্দ, এই নিয়ে তাদের তর্ক উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

অত বীরত্বের মধ্যে মেয়েরা নেই। তারা নিরিবিলি তুলছে কাপড় রাঙাবার জন্যে শিউলি ফুল। ছোট ছোট ভাই-বোন কোলে ক'রে পূজার মাঠে প্রতিমা দেখছে। নয়তো একটু বা ছুটে ছুটে চোখ টেপাটেপি খেলা করছে। কিন্তু তাতে হট্টগোল কম। এমন

কি তারা ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে যে ঝগড়া করছে, তাও নিরিবিলিতে।

হট্টগোল আছে রাখালের দলে। কিন্তু গ্রামে নয়, মাঠে। মাঠে গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে তারা মিলেছে যেখানে একটু ছায়া আছে সেইখানে, কোথাও বটগাছের নীচে, কোথাও বা আমবাগানে। কোথাও চলেছে কড়িখেলা, কোথাও ঝালঝুল, কোথাও হাডুডু। খেলার সঙ্গে দৃষ্টি কিন্তু গরুগুলোর দিকে ঠিক আছে। যেন তারা কারও ফসলে গিয়ে মুখ না দেয়। একটু বেচাল দেখলেই এখান থেকে চ্যাঁচাচ্ছে, গরুগুলো আর সেদিকে যাচ্ছে না। মারের ভয় সবাই করে।

চন্দ্রভূষণের খামারে বসেছে চাষীর দল। তাদের সমস্যা অন্যরূপ। সামনে পূজা। দু'চারখানা কাপড়-জামা কেনা আছে। কিন্তু তার এখনও দেরি আছে সপ্তাহ তিনেক। সেই ষষ্ঠীর দিন রাত্রে, কিংবা সপ্তমীর দিন সকালে কিনলেও হবে। তারপরে মাঠে চুরি হচ্ছে প্রচুর। চন্দ্রভূষণের সাতপোয়া খানার আবাদ একটু নাম্‌লা হয়েছিল। তাই এখনও কাটা হয়নি। গত রাত্রে তার প্রায় সিকি ধানের শিষ কে কেটে নিয়ে গেছে। এমন অবস্থা আরও কয়েকজনের হয়েছে। কিন্তু তাও যাকগে। আজকে সব জমিতে ধান কাটা আরম্ভ হয়েছে। আর কি নেবে? এখন সমস্যা হয়েছে হনুমান নিয়ে।

শ্রীরামচন্দ্রের সেবক দলের কল্যাণে গ্রামের মধ্যে তরিতরকারি তো একটি লাগাবার উপায় নেই। দলে দলে বিস্তর হনুমান গ্রামের মধ্যে গাছে গাছে, চালে চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝুপ ক'রে পড়ছে আর যা-হোক-কিছু নিয়ে চালে উঠছে। পাতার আড়ালে চট চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখলেও তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি নেই। মুশকিল এই যে, হিন্দু হয়ে শ্রীরামের দাসবংশকে মারবার উপায় নেই। দেখতে পেলে তাড়াহুড়ো দেওয়া, কিংবা টিন বাজানই সম্বল। হিন্দুসন্তানের

দুর্বলতায় তাদেরও সাহস বেড়ে গেছে। মেয়েদের তো তারা গ্রাহ্যই করে না। সম্প্রতি তাদের দৃষ্টি গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। তারা রীতিমতো মানুষের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে আখ খাচ্ছে। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে আলু। ফলে, ধান ছাড়া আর দ্বিতীয় ফসলটি হওয়ার উপায় নেই। তার কি করা যায়?

একজন বললে, হনু-মারা আনা হোক। আচ্ছা ওষুধ বাপু। হনু-মারা এসে তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়ান মাত্র হনুমান হাত জোড় করবে। আর নড়বে না। গ্যাঁজ ক'রে তীর গিয়ে বিঁধবে. আর টুপ ক'রে মাটিতে পড়বে।

চন্দ্রভূষণ ভক্তিমান লোক। গলায় তুলসীর মালা। সর্বাঙ্গে তিলক। শোনা মাত্র সে কানে আঙুল দিলে।

—তাই কি হয়! হিঁদুর ছেলে।

—সর্বনাশ! হনুমান মারা! যা কখনও হয়নি!

—তাহ'লে কি আর রক্ষে আছে! ছা-পোনা নিয়ে ঘর করতে হবে না?

—তবে কি হবে? আর কি করা যায়?

—তা কি জানি!

না, না। হনুমান মারা কিছুতেই হ'তে পারে না। বাপ-পিতেমো'র আমলে যা হয়নি তা কখনও···তবে হ্যাঁ,···

—কি বল?

চন্দ্রভূষণ হাতের ইসারায় সকলকে নিরস্ত করলে। বললে, আমি বলি শোন। চিরকাল যা হয়ে এসেছে···

সকলে সোৎসাহে বললে. এই কথা!

হনুমান মারা সম্বন্ধে অধিকাংশ চাষীই মত দিলে না। তার চেয়ে চিরকালের যে ব্যবস্থা চ'লে এসেছে, অর্থাৎ দূর মাঠে যেখানে হনুমান যায় না সেখানে আলু, আর কাছের আউশের জমিতে কালো মুগ, মুসুরি গম লাগানর ব্যবস্থা হ'ল।

—হ্যাঁ হে, তেওরা বুনবে নাকি ?

—তাই তো ভাবছি।

সবাই ভাবতে বসল।

—দিতে হ'লে আর দেরি করলে তো চলবে না।

—তা তো বটেই। কিন্তু···

এদের চাষের প্রত্যেক ব্যাপারে একটুখানি 'কিন্তু' থাকে। তৎসত্ত্বেও যে ধান হয় তার কারণ জমি খুব উর্বর। পারতপক্ষে অধিক শ্রম স্বীকারে এরা নারাজ। ধান এবং আখ এবং আলুটা উদরান্নের জন্যে নিতান্তই চাই। তাই এই তিনটে ফসল না লাগিয়ে পারে না। তদতিরিক্ত কিছু করতে গেলেই একটু 'কিন্তু' যোগ ক'রে দেয়। উপর্যুপরি কয়েকবার অজন্মা, ঋণভার এবং ম্যালেরিয়ায় যেমন এদের শরীর জরাজীর্ণ, তেমনি এদের বলদ-মহিষের। না পড়ে গভীর ক'রে লাঙল, না পড়ে উপযুক্ত পরিমাণ সার। এর উপর নতুন কিছু করতে গেলেই বাপ-পিতামহের দোহাই আছে। সেকালে জমির উর্বরা শক্তি বেশী ছিল। মানুষের প্রয়োজন ছিল সামান্য। জীবনযাত্রার প্রণালীও এত জটিল এবং ব্যয়বহুল ছিল না। সুতরাং তখন যা চলেছে এখন তাই চালাতে গেলে একদিকে টান পড়বে। কিন্তু তাহ'লে কি হয় ? চিরকাল ধ'রে যা চ'লে এসেছে আয়ের পথে কোথাও তার ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। অথচ ব্যয়ের দিকে এত ব্যতিক্রম এসেছে যে, তা আর বলবার নয়।

চন্দ্রভূষণ বললে, তেওরা দেওয়া হয়, তেওরাই ভালো। কিন্তু ব্যাপার কি হয়েছে জান ?

—সে ঠিক। এবারে ধান যে রকম বড় হয়েছে, একবার পড়লে তার আওতায় আর তেওরা হবার ···

—কিন্তু মাঠে আগল এবার ভালো ক'রে দিতে হবে। বুঝলে ? নইলে চোরের উপদ্রবে ফসল আর ঘরে উঠবে না।

চন্দ্রভূষণ তার আউশ ধান চুরির কথাটা আর কিছুতে ভুলতে পারছিল না। ঘুরে ফিরে মাঠে ভালো ক'রে আগলের ব্যবস্থা করার কথাই বারে বারে সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কথাটা অবশ্যই বিশেষ জরুরী। ফসল লাগান যেমন প্রয়োজন, সেই ফসল রক্ষা করাও তেমনি প্রয়োজন। সে কথা সকলেই জানে। প্রত্যেক মাঠে সে জন্যে আগলদার থাকে। ফসল ওঠার সময় প্রতি বিঘায় সে তার পারিশ্রমিক বাবদ দু' আঁটি ক'রে ধান নেয়। চন্দ্রভূষণ যে কেবল তার নিজের ক্ষতি এবং নিজের স্বার্থের দিক চেয়েই এজন্যে এত আগ্রহ দেখাচ্ছে এই ভেবে কেউ আর সে কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলে না।

সকাল বেলা।

বিনোদিনী এক প্রহর রাত থাকতে উঠে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। দু'দিন থেকে তার খুব খাটুনি যাচ্ছে। পুজোর ক'দিন তার আপিস বন্ধ থাকবে। সুতরাং একটা মাসের জন্যে যার যা চালের দরকার সব এখনি তৈরি ক'রে দিতে হবে। ওদিকে একটা মাস যেমন ছুটি, এদিকে একটা মাস তেমনি তার নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই।

রসময় কোন ভোরে স্নান সেরে এসে আহ্নিকে বসেছিল। তার আহ্নিক সারা হয়েছে। সুর ক'রে ক'রে সে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়ছিল ঃ

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥

কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এই চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধকধকি॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥

এই বইখানি পড়া শুনলেই বুঝতে হবে রসময়ের প্রভাতী উপাসনা শেষ হ'তে আর বাকি নেই। সকালের উপাসনা সাধারণতঃ ললিতা আর ও একাসনে ব'সে এক সঙ্গে করে। কিন্তু পূজা উপলক্ষে ক'দিনের জন্যে ললিতা ছুটি নিয়েছে। পূজার হাওয়া ওর মনের একাগ্রতা দিয়েছে নষ্ট ক'রে। উপাসনায় মন দিতে পারছে না। উপাসনা ছেড়ে দিয়ে ও এখন একরাশ শিউলি ফুল নিয়ে উঠানে বসেছে। টুকটুক ক'রে ফুল থেকে বোঁটাগুলো ছাড়িয়ে ডালায় রাখছে আর গুনগুন ক'রে গান গাইছে আপন মনে। ডালায় আরও অনেক বোঁটা রয়েছে। কতক একেবারে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, কতক আধ-শুকনো গাঢ় হলদে, কালকের গুলো ম্লান হয়ে আসছে, আজকের গুলো এখনও টক-টক করছে।

বিনোদিনী ঢেঁকিশাল থেকে বেরিয়ে এল। ললিতার ছেলেমানুষী দেখে ভ্রূভঙ্গি ক'রে বললে, মর্। শিউলির বোঁটা কুড়িয়ে রাশ করলি, কাপড় রাঙাবি নাকি?

পিছনের দিকে কটাক্ষ হেনে ললিতা হেসে বললে, রাঙাব না? আমি কি এমনি বুড়ী হয়েছি নাকি?

—না, এখনও কচিটি আছিস!

বিনোদিনীর দাঁড়াবার অবসর নেই। ঝাঁটা গাছটা নিয়ে আবার সে ঢেঁকিশালে গেল। তার ধানভানা হয়ে গেছে। কুলোয় একবার পাছ্ড়ে নিলেই এখনকার মতো ছুটি।

রসময় তখনও তেমনি সুরে প'ড়ে যাচ্ছে :

> লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
> লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম ॥
> দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
> স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎর্সন ॥
> সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
> কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥
> ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
> স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥
> অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
> কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্বর ॥

রসময় ভজন সেরে এসে বারান্দায় দাঁড়াতেই ললিতা উঠে গিয়ে হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মুখে-মাথায়-বুকে নিলে। জিজ্ঞাসা করলে, ভিক্ষেয় বেরুবে নাকি ?

—একবার বেরুব বৈ কি ?

একটু পরেই রসময় তার ঝুলি-ঝোলা নিয়ে গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল। ললিতার শিউলি ফুলের বোঁটা ছাড়ান হয়ে গিয়েছিল। ডালাখানা উঠানে মেলে দিয়ে সে একবার বিনোদিনীর ঢেঁকিশালে উঁকি দিলে।

—তোমার ধানভানা হ'ল ? ঢেঁকির পাড় দেওয়ার শব্দ শুনছি তো দুপুর রাত থেকে।

বিনোদিনী ধামায় ধান তুলছিল। পিছন ফিরে চেয়ে হাসলে। বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের উপর থেকে চূর্ণ কুন্তল সরিয়ে বললে, এবেলার মতো হ'ল বোন।

—এইবার ঘর নিকুতে হবে তো ? কাল রাঙামাটি এনেছি নদী থেকে। কী চমৎকার মাটি, দেখবি আয়। তোদের দেশে এমন মাটি পাওয়া যায় ? রাঙা টকটক করছে।

বিনোদিনী হঠাৎ এমন চমকে উঠল যে, কোমরে ফিক ব্যথা লেগে গেল। এতদিন সে নিঃশব্দে মুখ বুঁজে কাটিয়েছে। সমস্ত দিন তার ধানভানা আর ঘরকন্নার কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত মেলে না। মেলে রাত্রে। হাবল-মেনী নেই, শোয়া মাত্র তার কোল খালি বোধ হয়। পৃথিবী শূন্য ঠেকে। বুকের ভিতরটা হাহাকার ক'রে ওঠে। মনে পড়ে হারাণকে। কাছে থাকতে হারাণকে সে সইতে পারত না। প্রতি রাত্রেই তার সঙ্গে ঝগড়া বাধত। এই প্রথম টের পেলে সেই ঝগড়ার বাঁধনেই নিজেকে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। সন্ধ্যার পর কারও সঙ্গে একটুখানি ঝগড়া করতে না পেয়ে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। ভয় হয় কোন দিন ললিতা এবং রসময়ের সঙ্গেই না ঝগড়া বাধিয়ে ফেলে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে রাখে। কারও সঙ্গে বড় একটা কথাই কইতে সাহস করে না, পাছে কি বলতে কি ব'লে ফেলে।

এমনি করেই তার দিন যাচ্ছিল। হঠাৎ পূজা এসেই তার মনকে আরও চঞ্চল ক'রে তুললে। সেই চঞ্চলতার আগুনে ললিতা দিলে ধূপ ছিটিয়ে। মনে পাড়িয়ে দিলে তার এতদিনের এত যত্নে গ'ড়ে-তোলা ঘরখানির কথা। মন তার দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিনোদিনী কাৎরে উঠল, উঃ!

—কি হ'ল?

বিনোদিনী সামলে নিলে। তার অবস্থা হয়েছে চোরের মায়ের মতো। যন্ত্রণায় বুক ফেটে গেলেও চীৎকার ক'রে কাঁদবার উপায় নেই।

বললে, কোমরটায় কি রকম লেগে গেল।

—কি ক'রে লাগল?

—কি জানি।

বিনোদিনী ওঠবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সত্যিই তার কোমরে ব্যথা লেগেছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

ললিতা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, এই নাও! কোমরে ফিক ব্যথা লেগেছে বোধ হয়।

বিনোদিনী ফিকা হেসে বললে, এখনি ভালো হয়ে যাবে। অমন আমার মাঝে মাঝে লাগে।

—ভালো হলেই ভালো। দেখ দেখি, এখন তোমার হাতে কত কাজ। আর এই সময় প'ড়ে থাকলে কি ক্ষতিটা হবে বল দেখি? তা সে ক্ষতি চুলোয় যাক, যন্ত্রণাটাই কি কম! থাক, তোমাকে আর ঘর লেপতে হবে না। তুমি বরং শোওগে। তোমার চাল-টাল যা আছে আমি দেখছি। ওঠ।

—মরণ আর কি!

বিনোদিনী হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু যন্ত্রণায় ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। ললিতা ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ওর চালগুলো ঘরের মধ্যে গুছিয়ে রেখে এল। বিনোদিনী কিন্তু কিছুতেই শুতে রাজী হ'ল না। ঘাড়ে গামছা ফেলে স্নান করতে গেল। ললিতা কিছুতেই ঘড়া নিতে দিলে না। ওর সঙ্গে যেতেও চাইলে। কিন্তু বিনোদিনী আর কিছুতেই স্বীকার করলে না, ব্যথা বেশী লেগেছে। সে একাই গেল।

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ললিতা ওদের বড় ঘরের উপর পর্যন্ত নাগাল পায় না। একটা ছোট মই এনে সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলে। একটা বালতিতে রাঙামাটি গুললে। মইতে উঠে সেই রাঙামাটি-গোলা জল একটা ন্যাকড়ার তাল দিয়ে দেওয়ালে লেপতে লাগল।

বিনোদিনীর কোমরে ব্যথা না লাগলে সুবিধা হ'ত। দু'জন না হ'লে ঠিক হয় না। একজন নীচে থেকে ন্যাকড়ার গোলাটা তুলে দেবে, একজন মই চ'ড়ে দেওয়াল লেপবে। কিন্তু এ কাজে কোনো-কালেই তার দোসর কেউ ছিল না। এবারে সৌভাগ্যক্রমে বিনোদিনী এসে জুটেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার সাহায্যও পাওয়া গেল না।

তা না যাক। এতদিন যদি একাই সে গৃহ সংস্কার করতে পেরে থাকে, এবারও পারবে। আর ভারি তো কাজ! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, সবে তো একখানি মাত্র ছু'কুঠরি শোবার ঘর। আর একখানি রান্নাঘর। তা সে রান্নাঘরখানি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। যদি নিতান্তই সেখানি না পারে, ছু'দিন পরে বিনোদিনী সেরে ওঠার পর করলেও চলবে। সময় তো আর যায়নি। এখনও পূজার সপ্তাহ তিনেক দেরি আছে। এখন ভালোয় ভালোয় বেচারী শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠলে হয়।

ফিক ব্যথা বড় খারাপ। সহজে সারতে চায় না। তার নিজের একবার হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ভুগিয়েছিল। ডাক্তার কবিরাজ, নুনের সেক, তার্পিন তেল মালিস, কিছু আর বাকি রাখেনি। অবশেষে, সেই কথাটা ললিতার এতক্ষণে মনে পড়ল। ঘোষালদের অমলের পা বুলিয়ে নিয়ে ব্যথা সারে। জন্মের সময় অমলের পা আগে মাটি ছুঁয়েছিল। ব্যথার পক্ষে ওর পা বুলিয়ে নেওয়া একেবারে অব্যর্থ ঔষধ। ললিতা স্থির করলে, একটু পরেই ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে।

ওকে বারবার ওঠা-নামা করতে হচ্ছে। একবার ক'রে গোলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে নামছে, আর একবার মইয়ে উঠছে, আর সমস্তক্ষণ ভাবছে, কি ক'রে বিনেদিনীর ব্যথাটা অবিলম্বে সারতে পারে। আহা, বেচারীর হাতে এখন অনেক কাজ। উঠতে না পারলে, অনেক জায়গায় কথার খেলাপ হবে। ব্যবসার পক্ষে সে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ।

ললিতার পোশাকটি হয়েছে ভালো। গাছ-কোমর দিয়ে কাপড় পরা। তার উপরে কোমরে একখানি গামছা বেশ আঁট ক'রে জড়িয়েছে। চুলে গোলা-মাটি লাগবার ভয়ে মাথাতেও জড়িয়েছে আর একখানি গামছা। আর হাতের শাঁখাজোড়াকে বাঁচাবার জন্যে ছুই হাতের মণিবন্ধে বেঁধেছে ন্যাকড়া। তার কাপড়ে, গামছায়, মুখে, সর্বদেহে লেগেছে রাঙামাটির ছোপ। তা কি করবে? ওদের তো

পয়সাই নেই, যাদের পয়সা আছে, যারা সম্পন্ন গৃহস্থ,—কি ভদ্রলোক, কি চাষী,—সকলের বাড়ির মেয়েরাই এই কাজটা নিজের হাতে করে। এটা মেয়েদেরই কাজ। তাদের পূজার উৎসবের একটা অঙ্গ।

ললিতা আপন মনে গুনগুন ক'রে একটা বৈষ্ণব পদাবলী গাইছিল, আর গোলা দিচ্ছিল। হঠাৎ তার মইটা ন'ড়ে উঠতেই ভয় পেয়ে অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠল, মাগো!

নীচে তাকিয়ে দেখে রাধিকামোহন।

ললিতা অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেললে। টকটক ক'রে নীচে নেমে তার গাল দু'টো টিপে দিয়ে বললে, এরই মধ্যে এত পেকেছ! জামা খোল।

—কি হবে?

—খোল না! দেখছি কি হবে। খালি মেয়েছেলের মই টানলেই তো হবে না, তার অনেক ঠেলা আছে।

রাধিকা ভয়ে ভয়ে বললে, আমি দেওয়ালে গোলা দিতে পারব না কিন্তু।

ভ্রূভঙ্গি হেনে ললিতা বললে, তবে ইস্কুলে এতদিন এত টাকা খরচ ক'রে কি শিখলে? খালি তামাক খাওয়া?

ললিতার ইচ্ছার কাছে মাথা না নুইয়ে কারও উপায় নেই। রাধিকার গায়ে একটি গেঞ্জি মাত্র ছিল। সেটি তাকে খুলতে হ'ল। ঘরের ভেতর থেকে ললিতা একখানা আধ-ময়লা ছেঁড়া কাপড় এনে দিলে। সেটি সে নিজের কাপড়ের উপর পরলে।

ললিতা হেসে ওর মাথায় সস্নেহে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, দিব্যি সাজ হয়েছে! চমৎকার সাজ! আমার চেয়ে ভালো। যেটুকু খুঁত আছে, দু' পোঁচ গোলা লাগলেই ঠিক হয়ে যাবে।

রাধিকা বিপন্ন হয়ে বললে, আচ্ছা বিপদে পড়লাম, হ্যাঁ! এ জানলে কখ্‌খনো এদিকে আসতাম না। আমার ইস্কুলের বেলা হচ্ছে।

—ভালোই তো। একটা দিন কামাই করার সুবিধা হবে।

—হ্যাঁ, খুব সুবিধা! তারপরে কাল মাস্টারে আমার পিঠের ছাল তুলুক। তোমার আর কি বল?

ললিতা চোখ নাচিয়ে বললে, নাও, নাও। তোমার আর পিঠের ছাল উঠবে না। মার খেয়ে-খেয়ে শক্ত হয়ে গেছে। এত দিন ধ'রে কম মারটা তো খেলে না!

ললিতাকে এড়ান কঠিন। রাধিকা শুধু একবার লজ্জিতভাবে হাসলে। জিজ্ঞাসা করলে, কি করতে হবে, বল?

—দু'টি কাজ আছে, হয় তুমি নীচে থেকে গোলা তুলে দাও আমি দেওয়াল লেপি, নয় আমি গোলা দিই তুমি···

রাধিকা প্রস্তাবটা এক মুহূর্ত ভাবলে। বয়সে ছেলেমানুষ হ'লেও বুদ্ধিতে তার পাক ধরেছে। আর ললিতা বয়সে যতই বড় হোক তবু সে স্ত্রীলোক। তাকে মইয়ে চড়িয়ে নিজে নীচে থাকাটা অপৌরুষেয়। বললে, তুমিই গোলা দাও। আমি মইয়ে উঠি।

—সেই ভালো। কিন্তু লেপতে জান তো?

রাধিকা মইয়ে উঠতে উঠতে অবজ্ঞার সঙ্গে হাসলে। বললে, দু' পার্ট জ্যামিতি কষা আছে, বুঝলে? আর এ তো সামান্য ব্যাপার। কিন্তু একবার তামাক খাওয়া হ'ল না!

ললিতা মাথা নীচু ক'রে টিপেটিপে হেসে বললে, কিচ্ছু ভয় পেও না। আমি নিজের হাতে তামাক সেজে খাইয়ে, নিজের হাতে তেল মাখিয়ে দোব। তুমি চানটি সেরে ইস্কুল যাবে। কাজ করিয়ে নোব, মজুরি দোব না, তাই ভেবেছ?

রাধিকার বুকে হঠাৎ যেন কিসের একটা ঢেউ এসে আঘাত দিলে। ওর বুক দুরুদুরু ক'রে উঠল। তালু শুকিয়ে গেল। মনে হ'ল মস্তিষ্কের ভিতরটা একেবারে খালি হয়ে গেছে।. ললিতার চঞ্চল চোখের চাওয়ায়, ওর তরল হাসির লহরীতে, ওর বাঁশীর মতো মিষ্ট কণ্ঠস্বরে যেন মদ আছে। ওর সান্নিধ্যে মাঝে মাঝে রাধিকার মন-বুদ্ধি-চৈতন্য যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। যেন নেশা লাগে।

কিন্তু মাঝে মাঝে। পর মুহূর্তেই ললিতা যখন বড় দিদির মতো স্নেহে ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, দিগন্তছাওয়া ধোঁয়া আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো গুটিয়ে গিয়ে আবার মস্তিষ্কের কোন সঙ্কীর্ণ কোণে আত্মগোপন করে, আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

রাধিকা পেকেছে বটে, কিন্তু অকালে। বাইরে তার যতখানি রঙ ধরেছে, ভেতরে ততখানি পাক ধরেনি। কিছু কিছু সে বুঝতে পারে, কিন্তু অনেক কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু একটা অজ্ঞাতপূর্ব অদ্ভুত অনুভূতি তার স্নায়ুগুলোকে পর্যন্ত অবশ ক'রে দেয়।

ললিতা বালতিতে গোলা গুলে রাধিকাকে পোঁছে দিচ্ছিল। উপর দিকে চাওয়ার উপায় নেই, চোখে গোলা পড়বে। রাধিকা আড়ষ্ট হয়ে তার হাত থেকে গোলার ন্যাকড়া নিচ্ছিল। চোখে পড়ছিল ললিতার সুগঠিত তনুদেহের আভাস। লজ্জায় এবং কি যেন একটা আবেশে সে ভালো ক'রে চাইতে পর্যন্ত পারছিল না। যন্ত্রের মতো সে শুধু গোলা নিচ্ছে আর দেওয়ালে লেপছে, গোলা নিচ্ছে আর দেওয়ালে লেপছে···

হঠাৎ বিনোদিনীর হাসি শুনে সে থমকে গেল।

—কি হ'ল! —ললিতা বললে।

—তোমার মাথা হয়েছে। চোখ মেলে দেখ না কি হয়েছে।

বিনোদিনী ভিজে কাপড় ছাড়তে ঘরে গেল।

চোখ মেলে দেখে ললিতা মাথায় হাত দিলে। বলেল, সর্বনাশ! নাম, নাম। আমার যেমন অধর্মের ভোগ তাই তোমাকে গোলা দিতে দিয়েছি।

ভয়ে ভয়ে রাধিকা নেমে এল। উপর দিকে চেয়ে দেখে, সর্বনাশ না হোক, গোলা দেওয়া মোটেই হয়নি। অন্যমনস্কতায় এখানে এক খাবল পড়েছে, ওখানে এক খাবল পড়েছে। তার উপর একভাবে গোলা না দেওয়ায় মাঝে মাঝে দাগ পড়েছে।

অপ্রস্তুত হয়ে রাধিকা বললে, আমি তখনই বললাম, পারব না।

—তাই বটে আমারই অপরাধ হয়েছে। ললিতা সত্যসত্যই রেগে উঠল।

রাধিকার অঙ্গশ্রী দেখে বিনোদিনী হেসে ফেললে। রাধিকাকে সে লজ্জা করে না। ভিজে কাপড় নেঙরাতে নেঙরাতে ললিতাকে বললে, তা, তোর বাপু রাগ করা অন্যায়। ও ছেলেমানুষ, ওকে লাগিয়েছিস গোলা দিতে। তোরই বা আক্কেল কি!

ললিতার রাগ দেখে বেচারা এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। এখন একটু সাহস পেয়ে বিনোদিনীর দিকে চাইলে। সাহস পেলে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওর স্বপ্নের তাজমহলও হাওয়ায় গেল মিলিয়ে, মাথার ভিতরকার ধোঁয়ার কুণ্ডলী কোথায় গেল লুকিয়ে, রাধিকা বিনোদিনীর একটি কথায় আবার যে-ছেলেমানুষ সেই-ছেলেমানুষে পরিণত হ'ল।

বিনোদিনী সস্নেহে বললে, দেখ দেখি, মুখে কি ক'রে গোলা মেখেছ! দেখলে চেনা যায় না।

ওর মুখের শ্রী দেখে ললিতাও হেসে ফেললে। বললে, চমৎকার হয়েছে! যেমন হনুমান, তার তেমনি রূপ খুলেছে! এইবার ওই চেহারা নিয়ে গিয়ে ইস্কুলে দেখাও গে।

—আমি তখনই বললাম।

রাধিকা বিড়বিড় করতে করতে মুখ ধুতে গেল।

পিছন থেকে ললিতা বললে, হ্যাঁ, হাত মুখ ধুয়ে এসে এক কলকে তামাক খাও। যা পার। আবার বলে দু'পাট কষেছি। তোমার ও দু'পাটে কুলোবে না রাধারানী, আরও দু'পাট বেশী কষতে হবে।

ললিতা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। রাধিকার উপায় নেই, নিঃশব্দে সব টিপ্পনি সইতে হ'ল।

বিনোদিনী বললে, তোরও বাপু সব কাজেই ত্বাড়াতাড়ি। না হয় খাওয়া-দাওয়ার পরেই হ'ত।

—পরে হবে কি ক'রে? তুমি যে আবার কোমরে লাগালে।

—সে তখনই সেরে গেছে।

—বাঁচা গেল। এই আবার উন কাজ দুনো ক'রে ভেবেই মরি!

রাধিকা দুমদুম ক'রে এসে ললিতার দেওয়া ছেঁড়া কাপড়খানা খুলে দিলে। আলনা থেকে গেঞ্জিটা পেড়ে কাঁধে ফেলে গটগট ক'রে বেরিয়ে গেল। তামাকও খেলে না, তেলও মাখলে না।

ললিতা পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে, ও রাধারানী, শোন, শোন। পিছু ডাকছি, শুনে যাও।

কিন্তু রাধিকা আর ফিরল না। ললিতা হাসতে হাসতে বললে, খুব অপ্রস্তুত হয়েছে!

দুপুরবেলা আহারাদির পর বিনোদিনী তার ঘরের মেঝেয় আঁচল পেতে একটু গা গড়াচ্ছিল। তার মন তখন অনেক দূরে আর একখানি ঘরকন্নার কাজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার নিজের ঘরকন্নার কাজে। বড় ঘরখানিতে এবারে কে রাঙামাটির গোলা দিচ্ছে, কে জানে। গোলা দেওয়া হচ্ছে কি না তারই বা ঠিক কি! অযত্নে উঠানের কোণে কোণে হয়তো আগাছার জঙ্গল হয়েছে। ঘরে-দোরে, তুলসীতলায়, গোলার নীচে হয়তো আর মেড়ুলি দেওয়াই হয় না। জলের অভাবে তুলসী গাছটি হয়তো এতদিনে শুকিয়ে মরেই গেছে। ঘরের মেঝেয় ইন্দুরে হয়তো গর্ত খুঁড়েছে। চালে নিশ্চয় ঝুল জমেছে প্রচুর। দেওয়ালের কোণে কোণে মাকড়সাতে জাল বুনেছে। ছোট ঘরটা এখন নিশ্চয় অব্যবহার্য হয়ে আছে। কেউ তো আর সেটা ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করে না। সেটায় বহুসংখ্যক চামচিকাতে আশ্রয় নিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ক'রে তুলেছে। তার মুংলী-বুধী যত্নাভাবে হয়তো শীর্ণ হয়ে গেছে। বুধীর এতদিনে একটি বাছুর হয়ে থাকবে। কি বাছুর হয়েছে কে জানে।

আর হাবল-মেনী! তাদের কথা মনে আনতেও বিনোদিনী ভয় পায়। ভাবে, হয়তো হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কি ক'রে মা

ছেড়ে তারা এতদিন আছে সেই এক আশ্চর্য। কোথায় আছে তাই বা কে জানে! মামার বাড়িও যেতে পারে। যেতে পারে কেন, হয়তো সেখানেই গেছে। হারাণ ক্ষেতের কাজ করবে, না তাদের সামলাবে! সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে, একবার কেউ এসে তার খোঁজ পর্যন্ত নিলে না। তার সম্বন্ধে সকলের মনের ভাব এমনি বিষিয়ে উঠেছে। বিনোদিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

নিজের ঘরে ব'সে রসময় তামাক খাচ্ছিল। ললিতা পিছনে ব'সে একটা কাঠের চিরুনি দিয়ে তার চুলের জটা ছাড়িয়ে দিচ্ছিল।

কি কথা মনে পড়ায় রসময় ডাকলে, ও বিনোদিদি!

ললিতা তাড়াতাড়ি বললে, থাক থাক। ওকে আর ডেকে কাজ নেই। বেচারী ঘুমুচ্ছে। আজ হঠাৎ তার কোমরে বড্ড লেগে গেছে।

রসময় হেসে বললে, কোমরে নয়।

—তবে? কোমরেই তো। তুমি ছিলে নাকি তখন?

—ছিলাম না, কিন্তু জানি।

—কি জান বল তো!

—আঘাত লেগেছে।

ললিতা হেসে বললে, সে তো আমিও জানি। কোথায়?

—বুকে।

—যাঃ!

রসময় এবার আর হাসলে না। বললে, আঘাত বুকেই বটে। কি যে হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। হারাণদারই বা কি হ'ল বল তো! এ দিকে তো একটা দিন বিনোদিদিকে ছেড়ে থাকতে পারত না। আর মাসখানেকের উপর হয়ে গেল···পুজো আসছে···

—তুমি যাও না একদিন।

মাথা নেড়ে রসময় বললে, তাই যাব। দূরের পথ, যাই-যাই ক'রেও যাওয়া আর হয়ে উঠছে না।

বিনোদিনী দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। বললে, কি বলছ?

রসময় চেয়ে দেখলে, ওর মুখের রক্ত কে যেন চুষে নিয়ে গেছে। চোখ ফুলো ফুলো। কিন্তু বিস্ময় গোপন ক'রে হেসেই বললে, জিগ্যেস করছিলাম ক'টা রাত?

দোরগোড়ায় ব'সে মুখ নামিয়ে, হেসে বিনোদিনী বললে, সব ক'টা বেজে গেছে। কেন, আমি কি ঘুমিয়েছিলাম নাকি?

—কি করছিলে তবে! চোখ বন্ধ ক'রে বিশ্রাম করছিলে?

—হুঁ।

—কিন্তু নাক ডাকছিল কেন?

—যাও। মিথ্যে কথা ব'ল না।

—মিথ্যে! তোমার বোনকে জিগ্যেস কর।

ললিতা তাড়াতাড়ি বললে, না রে। মিথ্যে কথা।

—ওই দেখ। তুমি ভারি মিথ্যেবাদী।

রসময় হেসে ফেললে। বললে, তা হবে। কথায় বলে চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

ললিতা এবং বিনোদিনী দু'জনে একসঙ্গে বললে, হ্যাঁ। তাই বৈ কি! নিজে মিথ্যেবাদী, তাই বল।

রসময় হেসে বললে, আচ্ছা তাই বললাম। কিন্তু তুমি শিউলি ফুলের বোঁটা কুড়োলে কতগুলো?

নাক ঝামটা দিয়ে বিনোদিনী বললে, মরণ আর কি!

—কেন, মরণ আবার কি? পুজোর জন্যে কাপড় রাঙাবে না? সবাই তো রাঙাবে।

রসময় ললিতার দিকে ইসারা হানলে।

বিনোদিনী ললিতার দিকে চেয়ে হেসে বললে, তা রাঙাক।

ললিতা রেগে গেল। বললে, ও! আমি কাপড় রাঙাচ্ছি তাই তোমাদের চোখ টাটাচ্ছে! কেন, আমার বয়েস গেছে নাকি, তাই সখ যাবে!

ওর রাগ দেখে রসময়, তার সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীও, হেসে ফেললে। তা দেখে ললিতা আরও রেগে উঠল। ললিতা যত রাগে ওরা তত হাসে। অবশেষে ওদের হাসি আর থামে না দেখে ললিতা রেগে উঠে চ'লে গেল।

বিনোদিনী হেসে বললে, একেবারে ছেলেমানুষ।

রসময় চট্ ক'রে বললে, তা ছেলেমানুষ হবে না তো কি হবে? তোমারই তো বয়িসী।

বিনোদিনী ললিতার চেয়ে চালাক। বললে, এইবার আমার পেছনে লাগলে বুঝি। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই।

—তাই দেখছি। আচ্ছা বিনোদিদি, তোমার রঙিন কাপড় পরবার সখ হয় না?

—না ভাই। কখ্খনো না।

মাথা নেড়ে রসময় বললে, তাই দেখছি। তোমার সঙ্গে কি ক'রে যে ওর ভাব হ'ল তাই ভাবি। এত ভাবও কখনও দেখা যায় না।

—কেন, তাতে আশ্চর্যিটা কি!

আশ্চর্যি আছে। তোমার সঙ্গে ওর কোথাও মেলে না।

বিনোদিনী চুপ ক'রে রইল। অত সে ভেবে দেখেনি। রসময় আবার তেমনি ক'রে মাথা নেড়ে বললে, কেবল একটি জায়গায় মিল আছে। তোমাদের দু'জনেরই মনটি ভালো। দয়া-মায়া আছে, মানুষকে আপন ক'রে নিতে পার।

বিনোদিনী হেসে বললে, আর অমিলটা কোথায়?

—সব জায়গায়। ও হ'ল প্রজাপতির মতো। রঙিন পাখা মেলে ভেসে ভেসে বেড়াবে। আর তুমি হ'লে ইয়ে, একটা বাবুই পাখী। যত্ন ক'রে বাসা একটি বাঁধাই চাই।

—কিন্তু বাসা টেঁকে কই?

রসময় তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ওর দিকে একবার চেয়েই অন্যমনস্ক হয়ে বললে, হয়তো টেঁকে না। কোথাও বাসা বাঁধার দোষে, কোথাও ঝড়ের

দোষে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টেঁকে। খানিকটা ছুলেই আবার স্থির হয়ে যায়।

এমন ক'রে সমস্যাটা কখনও বিনোদিনী ভাবেনি। ওরই মধ্যে একবার ভাবতে চেষ্টা করলে, কোথায় তার বাসা বাঁধার দোষ হ'তে পারে। ভেবে পেলে না। ওর চেয়ে বেশী শ্রদ্ধায় আর কেউ ঘর বাঁধে না কখনও। বললে, সবই অদেষ্ট।

—সে তো বটেই।

রসময় একটু ভেবে অন্য দিকে চেয়ে বললে, হারাণদাও আচ্ছা লোক বটে! একদিন এদিক দিয়ে এল না! কেমন আছে তাই বা কে জানে! ছেলে দু'টোই বা···

বিনোদিনীর বুকের ভিতরটা ধক ক'রে উঠল। মুখ ছাইএর মতো সাদা হয়ে গেল। সে ঘাড় হেঁট ক'রে নখ খুঁটতে লাগল।

রসময় বোধ হয় ওর কাছে কোনো উত্তর প্রত্যাশা ক'রে এক মিনিট চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, লোকটা ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে কেমন, সে খবরটাও তো একবার নেওয়া দরকার। কিন্তু যায় কে? আমি তো ··· আমার তো···

বিনোদিনীর কাছ থেকে তথাপি কোনো সাড়া এল না। এমনকি সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলে তাও বোঝা গেল না। রসময় একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, দেখি।

বিনোদিনী আস্তে আস্তে বাইরে চ'লে গেল। সেখান থেকে রসময়ের উদ্দেশে বললে, ললিতা আবার গেল কোথায়?

রসময় হেসে উত্তর দিলে, দেখ, আবার শিউলির বোঁটাগুলো নদীতে ফেলে দিতে গেল না তো?

বিচিত্র নয়। খিড়কির দরজা খোলা। ওরা নদীর ঘাটে এই খিড়কির পথ দিয়েই যাতায়াত করে। তাতে ঘাট কাছে হয়। তার উপর পথটা নির্জন। ললিতার ছেলেমানুষীর কথা ভেবে তার হাসি এল। মেয়ের সখটুকুও আছে, রাগটুকুও আছে!

খিড়কির দরজার কাছে আসতেই ললিতার গলা পাওয়া গেল। উঁকি দিয়ে দেখে জামরুল গাছের নীচে ললিতা ছুটোছুটি ক'রে জামরুল কুড়োচ্ছে। তার আঁচল জামরুলে ভর্তি। ভোজন ক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলছে।

তাকে দেখেই চাৎকার ক'রে ডাকলে, আয় না। কি চমৎকার জামরুল ধরেছে!

গাছের দিকে চেয়ে দেখে সুদাম সখা গাছে উঠে পেড়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে ললিতা কখন তাকে পাকড়ে গাছে উঠিয়েছে। বিনোদিনী ঘোমটা টেনে স'রে এল।

॥ তিন ॥

রসময় যখন কমলপুরে পৌঁছল তখন সবে সূর্য উঠছে। শরৎকালের প্রভাত। নানা আকারের অনেকগুলো ধূসর মেঘের স্তূপ ভেঙে সূর্যকে উঠতে হয়। তার পরে দেখতে দেখতে পূর্বাকাশ কে যেন সোনা দিয়ে মুড়ে দেয়। শিশির-ধোয়া নোনা আতা আর জামগাছের চিকন পাতায় সোনালী আলো যেন পিছলে পড়ে। ঝিকমিক করে কৃষ্ণচূড়া আর কেলিকদম্ব গাছের মাথায়।

তিন মাস পরে রসময় আবার কমলপুরে এল। পল্লীর পথ। একবার হাঁটলে যেন আত্মীয় হয়ে যায়। পরে যখনই সে-পথে চলা যায়, মনে হয় যেন কতদিনের পরিচিত পথ। যেন কতকালের আত্মীয়। বন্ধুজনের স্নেহস্পর্শের মতো কোমল এবং স্নিগ্ধ। তার মনে হ'ল ঘাসে ঘাসে পথরেখা শীর্ণ হয়ে এসেছে। মাঠেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন দেখে গিয়েছিল শূন্য মাঠ। সবে চাষ দেওয়া হয়েছে। দূরে দূরে এখানে ওখানে জমির কোণে কোণে বিঘত প্রমাণ ধানের কচি চারাগুলো হাওয়ায় লিকলিক করছে। আর এখন গাঢ় সবুজ, সতেজ ধান মাঠময় যেন হাসছে। মাঝে মাঝে আউশের জমিগুলো নিরাভরণা বিধবা রমণীর মতো আপনার আকস্মিক সর্বনাশে বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছে। এত বড় দুর্গতির জন্যে যেন প্রস্তুত ছিল না।

গৈরিকবসনা ময়ূরাক্ষী খরস্রোতে চলেছে ব'য়ে। এ ময়ূরাক্ষী তাদেরই গ্রামপ্রান্তের সেই প্রবাহিনী, তবু যেন সেই নয়। নতুনতর

আবেষ্টনীর মধ্যে নতুনতর রূপ নিয়েছে। বিশেষ ক'রে বুড়ো বটগাছটি এবং স্নানের ঘাটের অনতিদূরবর্তী করবীগাছের ঝাড় যেন একে বিশেষ শোভায় শোভিত করেছে। এটিকে দেখলে তাদের নিজের গ্রামের ঘাটটি ন্যাড়া বোধ হয়। তবু তো ঘাট থেকে খানিকটা দূরেই তাদের বাড়ির পিছনের আমবাগানটি আছে। নইলে আরও নিরাভরণ বোধ হ'ত।

এদের গ্রামে ওদের নিজের গ্রামের মতো বড় বড় পুকুর নেই। গ্রামখানি যেমন ছোট, পুকুরগুলোও তদনুরূপ। বর্ষার জলে সেগুলো কানায় কানায় ভ'রে অভিমানিনীর আয়ত নয়নের মতো টুলটল করছে। অনেকগুলোতে লাল নীল শালুক ফুল ফুটে অপরূপ শোভা হয়েছে। কোনো কোনোটি যত্নাভাবে কচুরী পানায় একেবারে ম'জে গেছে। তারই আবার বেগুনী ফুলের বাহার কত!

রসময় মাঠ ছাড়িয়ে গ্রামের মুখে তেঁতুলতলায় এসে থামল। তার বাউলের বেশে যেটুকু ত্রুটি ছিল সংশোধন ক'রে নিলে। ললাটের তিলক রেখা, নাকের রসকলি ঘামে ম্লান হয়ে এসেছে। সে ত্রুটি সংশোধনের আর উপায় নেই। সে শুধু মাথার ঝুঁটিটা ঠিক ক'রে নিলে। পথচলার সুবিধার জন্যে বহির্বাস গুটিয়ে নিয়েছিল, সেটা খুলে দিলে। পায়ে পরলে নূপুর। একতারায় একটা ঝঙ্কার দিয়ে দেখলে ঠিকই আছে। তার পর একটা গানের কলি গুনগুন ক'রে ভাঁজতে ভাঁজতে গ্রামে ঢুকল।

কুমোরবাড়ি ডাইনে ফেলে ক'খানা বাড়ি গিয়েই হারাণের বাড়ি। সদর দরজার সামনে এসে রসময় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এ-বাড়ি আর সে-বাড়ি ব'লে মনেই হয় না। এই কয় মাসে এমন শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। পথ চলতে চলতে কারও গরু দরজার চালে একটা টান দিয়ে গেছে। সেখানকার খড়গুলো ঝুলে রয়েছে। হয়তো হারাণ নিজেই কোন সময় দরজায় কাদামাখা হাত মুছেচে, সে আর ধোয়া হয়নি। উঁকি দিয়ে দেখলে গোয়ালঘরে ঢোকার মুখে মানুষের কোমর-সমান ঘাস

জন্মেছে। বোধ হয় হনুমানের উৎপাতে গোলার চাল গেছে ব'সে। অমন যে তকতকে উঠান, তাতেও ঘাসের অপ্রতুল নেই।

রসময় ভিতরে গেল। জনমানবের সাড়া পেলে না। চেয়ে দেখলে, যেমন শ্রী বড় ঘরের দাওয়ার, তেমনি শ্রী রান্নাঘরের। কত কাল যে নিকোন হয়নি তার ঠিক নেই। মনে হয়, এখানে বুঝি গরু বাস করে, দাওয়া দু'টো এমন এবড়ো-খেবড়ো। সে একটু দ'মে গেল। হাবল-মেনীকে দেখতে পেল না। হারাণেরও সাড়া নেই। ওরা কি এখান থেকে চ'লে গেল নাকি?

কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সে খুব জোরে জোরে একতারায় দু'টো ঝঙ্কার দিলে।

গোয়ালঘরের দিক থেকে কার যেন কাশির শব্দ এল। মনে হ'ল হারাণেরই।

একটু ভরসা পেয়ে রসময় গান ধরলে:

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমরা ভেবে করব কি?
এ যে, ঝিএর পেটে মায়ের জন্ম
তোমরা তারে বল কি?

ছ'মাসে কন্যার উৎপত্তি,
ন'মাসে সে গর্ভবতী,
ভাইরে, বারো মাসে তিনটি সন্তান
কোনটি করবে ফকিরী?

ঘর আছে তার দুয়ার নাই
মানুষ আছে, কথা নাই,
ভাইরে, কে যোগায় তার আহারাদি
কে যোগায় সন্ধ্যায় বাতি?

মদন শা ফকির বলে,
মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে
ভাইরে, এ কথায় যে উত্তর করে
সেই তো করবে ফকিরী।

হারাণ কাশতে কাশতে এক ঝুড়ি শানি নিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ওর দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। রসময়ের মনে হ'ল হারাণ একটু শীর্ণ হয়ে গেছে, এবং কুঁজো। হারাণের প্রত্যাগমনের আশায় সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

গরুকে খেতে দিয়ে হাত ধুয়ে তখনই হারাণ ফিরে এল। এবারও সে ওর মুখের দিকে চাইলে না। ভাঁড়ার ঘর খুলে এক মুঠো চাল নিয়ে যখন দিতে যাবে তখন হঠাৎ রসময়ের মুখের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। হারাণ চমকে এক পা পিছিয়ে গেল।

ঈষৎ হেসে রসময় জিজ্ঞাসা করলে, ভালো আছে?

উত্তরে বিড়বিড় ক'রে হারাণ কি বললে বোঝা গেল না। সে টকটক ক'রে বড় ঘরের দাওয়ায় উঠল। পিছু পিছু রসময়ও দাওয়ায় বসল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নিঃশব্দে ব'সে রইল।

হঠাৎ এক সময় হারাণ উঠে বললে, ব'স। তামাক সাজি।

রসময় বসেই রইল। সে বুঝেছে, হারাণের মন এখন সুস্থ এবং স্বাভাবিক নয়। একটু হালকা হয়ে হারাণ নিজে কোনো কথা না পাড়লে তাকে কোনো প্রশ্ন করা ঠিক হবে না।

হারাণ তামাক সেজে এনে নিজেই ফসফস ক'রে খুব খানিক টানলে। তার পর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে কলকেটা নামিয়ে দিয়ে ওকে বললে, খাও।

রসময় তার ঝুলি থেকে ছোট্ট কাঠের হুঁকোটি বের ক'রে তামাক খেতে লাগল। নিঃশব্দে।

একটু পরে হারাণ বললে, দেখছ তো কাণ্ড!

—দেখছি। এরা সব গেল কোথায়?

—হাবল-মেনী তাদের মামার বাড়িতে আছে। হারাণ হঠাৎ থেমে গেল।

—আর বিনোদিদি?

হারাণ একটুক্ষণ আকাশের দিকে স্থির হয়ে চেয়ে রইল। তারপর বললে, নেই।

—কোথায় গেল?

হারাণ ওর চোখে চোখ ফেলতে পারছিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বোধ হয় মারা গেছে।

রসময় হাসি চাপতে গিয়েও হেসে ফেললে।

—বোধ হয় মারা গেছে কি করম? তুমি ঠিক জান না?

মাথা দুলিয়ে হারাণ বললে, না, সে একরকম জানাই বটে। মারাই গেছে।

ওর উত্তর দেবার ভঙ্গিতে রসময় আবার হেসে ফেললে। সেই হাসি দেখে হারাণ সোজা হয়ে উঠে বসল। ওর চোখ জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে। বললে, তুমি কি ব'লতে চাও? মরেনি? কোথায় গেল তবে?

রসময় সে কথার উত্তর দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছিল?

অন্যমনস্কভাবে হারাণ বললে, কিছুই হয়নি।

—তবে?

হারাণ জবাব দিলে না। বোধ হয় শুনতেই পায়নি। আপন মনে বললে, মারা না গেলে পেটের ছেলে ছেড়ে মানুষ ক'দিন থাকতে পারে? সে কথা ভেবে দেখ।

রসময় বুঝলে, এবেলা এখানে না থাকলে সকল কথা জানা যাবে না। কিছু একটা কঠিন কাণ্ড হয়েছে নিশ্চয়। এবেলাটা থাকলে অল্পে অল্পে সবই জানা যাবে।

ঝুলিটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার পুকুরে মাছ কি রকম হে?

হারাণ তখন যেন কি ভাবছিল। বললে, মাছ খাই না।

রসময় আবার হেসে উঠল।

—তুমি না হয় পৈতে পুড়িয়ে বেহ্মচারী হয়েছ। আমি তো খাই। খেয়াজালটা আছে তো? না সেটাও পুড়িয়ে দিয়েছ?

এতক্ষণে যেন হারাণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। মাছ আমি ধ'রে আনছি। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বিলক্ষণ! এই বেলায় কি আর না খেয়ে যাওয়া হয়?

হারাণ অতিথি সৎকারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অতিথি সৎকারে হারাণের কখনই আলস্য নেই। তখনই সে গিয়ে পুকুর থেকে একটা ভালো মাছ ধ'রে নিয়ে এল। কোথা থেকে কতকগুলো কাঠমুঠ কুড়িয়ে নিয়ে এল জ্বালানির জন্যে। মুদীর দোকান থেকে তেল, নুন এবং আবশ্যকীয় মসলাপত্র নিয়ে এল। অভাব কেবল তরকারির। ঘরে কতকগুলো কচু ছাড়া আর কিছু নেই।

বললে, আজ শুধু মাছের ঝোল আর ভাত ভাই। তরকারিপত্রের বড় অভাব।

—কেন, সেবার যে তোমার ওইখানটায় অনেক কিছুর গাছ দেখে গেলাম! বেগুন, মরিচ, সীম, কত কি!

হো হো ক'রে হেসে হারাণ বললে, সে সব সাবাড় হয়ে গেছে। জল পড়ে না, কিছু না।

—তা বটে।

—আর কিসের জন্যেই বা অত হাঙ্গাম পোয়াব! ছেলেমেয়ে দু'টো মামার বাড়িতে প'ড়ে রইল। নিজের একটা পেটের জন্যে আর অত খাটা যায় না। কি বল?

—তা তো বটেই!

—খাবারও হাঙ্গাম কিছু নেই। বেগুন, কচু, মূলো, কাঁচকলা যা পাই ভাতের মধ্যে দিই ফেলে। ওই এক পাকে যা হ'ল তাই হ'ল। তার ওপর দুধ খানিকটা থাকে।

রসময় বললে, আবার কি চাই?

—যা বলেছ। তাও রোজ রাঁধতে ভালো লাগে না। ওসব কি আর বেটাছেলের কাজ হে! যাদের পোষায় তাদের পোষায়, আমার তো ভাই পোষায় না।

—কি কর তবে?

—কি আর করি! এক বেলা রাঁধি, চার বেলা খাই। গরম ভাতের আমি ততটা ভক্ত নই! পান্তা ভাতই ভালো লাগে।

—তা মন্দ নয়।

—হাঙ্গাম কেবল গরুগুলোকে নিয়ে। ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি মামার বাড়ি। কিন্তু ওদের আর কারও হাতে প্রাণ ধ'রে দিতে পারিনি। অবলা জীব! বড় মমতার জিনিস হে!

—তা আর নয়!

—হ্যাঁ। এ আছি এক প্রকার মন্দ নয়। কোনো ভাবনা চিন্তে নেই। কেবল···

—তোমার মাছগুলো কোথায় রাখব?

—রাখ ওইখানেই। কেবল, কি জান, অসুখ-বিসুখ হ'লেই মনটা বড় তন্‌ছোট করে।

—অসুখ-বিসুখ এখানে খুব হচ্ছে নাকি?

—না ভাই, ভগমানের ইচ্ছেয় সে সব বালাই নেই। তবে ওই যা ম্যালোয়ারি। ·

—হ্যাঁ, সে তো আছেই।

—ব্যস। ওই যা। ওতেই সবাই একবার ক'রে ভোগে। নইলে জ্বর-জ্বালা যাকে বলে, কিচ্ছু নেই। এ সোনার গাঁ।

—তা ভালো বলতে হবে।

উৎসাহিত হয়ে হারাণ বললে, ওই যে বললাম, সোনার গাঁ। তা ভগমানের ইচ্ছেয়, বলতে নেই, এর আগে আমার মাথাটি কখনও ধরেনি। কেবল এইবার কাবু করেছিল।

—জ্বর হয়েছিল বুঝি?

—জ্বর কেমন? লেপের ওপর লেপ, তার ওপর লেপ। কাঁপুনি আর থামে না। ভয় হ'ল, ভাবলাম···

—ম্যালোয়ারি বোধ হয়!

হারাণ হো হো ক'রে হেসে বললে, আবার কি! আমি তো ভয়ে মরি। শেষটায় সবাই বললে, ভয়ের কিছু নেই। ও ম্যালোয়ারি। আহার বন্ধ দিও না। গোটাকতক কুনিয়ানের পিল এনে খাও, ব্যস।

—সেরে গেল?

—সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চয্যি ওষুধ বটে বাপু। দু'টো বেগুন ও-বাড়ি থেকে চেয়ে আনব নাকি? মাছের ঝোলে বেগুন মজে ভালো। কি বল?

রসময় তাড়াতাড়ি বললে, কি দরকার? কচু আছে, আর কি চাই?

—যা বলেছ! লোকের বাড়ি চাইতে আমার ভালো লাগে না। গাঁয়ে-ঘরে নেওয়া-দেওয়া সবাই তো করে। কিন্তু তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ঘরে আমার কোনো সামিগ্রির অভাব ছিল না। কারও ঘরে গিয়ে কখনও বলতে হয়নি, এইটে দাও!

—তা বটে তো। ঘরে লক্ষ্মীশ্রী থাকলে···

—ওই যা বলেছ। —গলা নামিয়ে হারাণ বললে, হাবলের মায়ের লক্ষ্মীশ্রী ছিল। যে গাছটি লাগিয়েছে তাই ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। যেখানে হাত দিয়েছে তাই থইথই ক'রে উঠেছে।

হারাণ চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগল।

—একটু তামাক খাও হারাণদা।

—এই যে খাই।

হারাণ ঝেড়ে উঠে তামাক সাজতে বসল। রসময়ের উনুন ধ'রে গেছে। ভাতের হাঁড়িটা চড়িয়ে দিয়ে আপন মনে গুনগুন ক'রে গানের একটা কলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইতে লাগল।

হারাণ হেসে বললে, আমাকে গান শিখিয়ে দিতে পার রসময় ?

রসময় হেসে বললে, কি হবে ?

মুখ নামিয়ে হেসে হারাণ বললে, একলা শুয়ে থাকি। রাত্রে ঘুম বড় একটা হয় না। মনে হয়, একটা যদি গান জানতাম তো গাইতাম।

হারাণ হো হো ক'রে হেসে উঠল।

রসময় চমকে ওর দিকে চাইলে। ওর ভয় হ'ল হারাণের মাথা খারাপ হয়নি তো ? ও অবশ্য চিরকাল জোরে জোরেই হাসে। কিন্তু এ যেন তাছাড়াও কেমনতর ! রসময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

হারাণ বললে, আজ রাত্রে তোমাকে ছাড়ছি না ভাই। রাত্রে শুয়ে শুয়ে গান শোনা যাবে।

ওকে ছেড়ে যেতে রসময়েরও যেন মন সরছিল না। ওর মনে হ'ল বিনোদিনীকে একবার এখানে আনতে পারত তো দেখত, সে কত বড় নিষ্ঠুর। একবার ভুলেও সে এমন স্বামীর নাম করে না ! আশ্চর্য !

মুখে বললে, বেশ তো।

হারাণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, ঠিক তো ভাই ! ফাঁকি দিয়ে পালাবে না তো ?

হারাণের স্বর ভারি হয়ে উঠল।

—না থাকব।

হারাণ এখন থেকেই রাত্রের আয়োজনে মেতে গেল। বললে, তাই ব'লে এবেলার মাছ আর ওবেলায় রাখতে হবে না। ওসব এবেলার। রাত্রে আলাদা মাছ ধরব এখন। পুকুরে মাছ হয়েছে অযচ্ছল। কি হবে অত মাছে, বল ? মেয়েটার বিয়ে ? তার ঢের দেরি।

রসময় বললে, তোমার উনুনে আগুন দাও।

—এই যে দিই। কি জান রসময়, আর কারও জন্যে না হোক, ওই মেয়েটার জন্যে মাঝে মাঝে মনটা হু হু ক'রে ওঠে। অথচ আনিই বা কি ক'রে বল ?

হারাণ ফুঁ দিয়ে দিয়ে অতি কষ্টে উনুনটা ধরিয়ে ভাতের হাঁড়িটা চাপালে। ধোঁয়া লেগে ওর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। টপটপ ক'রে জল পড়ছে। দু' হাতে চোখ ঘষতে ঘষতে বললে, বাবাঃ! এই কাজ আবার মরদে পারে ? সকালে উঠলাম, এক বিঘে জমি চ'ষে দুপুর বেলায় ফিরে এলাম। তা না তো···হুঃ!

রসময় হেসে বললে, তবেই বোঝ, মেয়েরাও ব'সে ব'সে ভাত খায় না। তাদেরও খাটুনি আছে।

—তা আবার নয় ? কাক কলকল করছে। কে আবার আসে দেখ।

একটু পরে হেসে বললে, আমার আর কে আসবে ? তিন কুলে কেউ নেই। তার দায়ে নিশ্চিন্তি।

রসময় হেসে বললে, তবে ভয়টা কি ?

—ভয়ের কথা কি বলছি ? ভয় নয়। মানুষ-জন আসা-যাওয়া না করলে গেরস্তর বাড়ি মানায় ? এই তুমি এসেছ, কত ভাগ্যি! মনে কত আহ্লাদ হয়েছে। আসবার কেউ নেই, তাই বলছি।

আবার বললে, তোমার মতন বোষ্টম হয়ে গেলে হয়। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু গান যে জানি না।

রসময় বললে, আমার ঝঞ্ঝাট নেই কি ক'রে জানলে ? মায়াময়ীর মায়া পাকে পাকে জড়িয়ে আছে।

—তোমাকেও ? —হারাণ যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—নিশ্চয়।

হারাণ নির্বাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেললে। তবে আর সে যাবে কোথায় ?

একটু পরে হারাণ বললে, তবে যে বলে, ভগমানের নাম করলে মনে শান্তি আসে ?

—সে নাম তো এখানে ব'সেও করতে পার ভাই।

হারাণ হঠাৎ রেগে গেল। বিরক্তভাবে বললে, তোমার এক কথা রসময়! বাড়িতে ব'সে আবার ভগমানের নাম হয়! হুঁঃ! বলে, বেলতলায় আম পাওয়া গেলে লোকে আর আমতলায় যেত না।

রসময় আর এ কথার জবাব দিলে না।

হারাণ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, হাঁড়িতে যেন খানিকটা আমচুর দেখেছিলাম। মাছের টক করলে হয় না ?

—তা হয়।

হারাণ ব্যস্তভাবে উঠে ভাঁড়ার ঘরে গেল। এ-হাঁড়া ও-হাঁড়া হাতড়ে অবশেষে আমচুরের মতো কি কতকগুলো নিয়ে এল। সে আর আমচুর ব'লে চেনবার উপায় নেই। এর মধ্যে একদিনও রোদে দেওয়া হয়নি। উপরে সাদা সাদা ছাতা পড়েছে।

নাক কুঁচকে রসময় বললে, এ যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে!

—তাই তো দেখছি।

—তবে ?

রসময় মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'ল। হারাণের কথায় মাছের টকের জন্যে তার মন লোভার্ত হয়ে উঠেছিল।

লোভ হারাণেরও কম হয়নি। সস্নেহে দুই হাতের মধ্যে আমচুরগুলো নাড়াচাড়া ক'রে বললে, ধুয়ে নিলে হয় না ?

এ বিষয়ে রসময়ের অভিজ্ঞতাও তার চেয়ে বেশী নয়। ললিতা রেঁধে দেয়, সে কষ্ট ক'রে খায়। একটু চিন্তা ক'রে বললে, কি জানি! হ'তেও পারে হয়তো।

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে হারাণ বললে, তা আবার হবে না কেন ? ওপরটুকুতেই তো কেবল ছাতা ধরেছে।

—তা বটে।

হারাণ আরও উৎসাহিত হয়ে গলা চড়িয়ে বললে, টক তো হবে হে বাপু! তাহ'লেই হ'ল।

আমচুরের বর্ণসুষমা দেখে রসময়ের মন খুঁতখুঁত করছিল। অথচ লোভও প্রবল। বললে, দেখলে হয়।

হারাণ আমচুরগুলো নিয়ে পুকুরঘাটে গেল। একটু পরে ধুয়ে নিয়ে এসে হাত মেলা ক'রে হাসতে হাসতে বললে, আঃ! দেখ! একবার দেখা হোক! এ আর চেনবার যো নেই, দিব্যি ভদ্দরনোক হয়ে গেছে।

চেয়ে দেখে রসময়ের মনের গোল কেটে গেল। মুখমণ্ডল প্রফুল্লভাব ধারণ করল। একটা শালপাতা পেতে বললে, এইখানে রাখ।

তরকারি নেই নেই ক'রেও আহারের ঘটা বড় কম হ'ল না! কচু সিদ্ধ, কচুতে মাছে ঝোল, কচুতে মাছে টক। তার সঙ্গে ডাল তো আছেই। দু'জনে পাশাপাশি নিঃশব্দে খেতে বসল।

একটু পরে খেতে খেতে হারাণ আপন মনেই হেসে ফেললে।

—হাসছ যে!

—হাসিনি। একটা কথা মনে পড়ল।

—কি কথা?

হারাণ হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বললে, লোকে যে আবার বিয়ে করতে বলছে হে!

—তাই নাকি?

—আর বল কেন! এ বয়সে আবার বিয়ে! —হারাণ তার চিরাভ্যস্ত উচ্চকণ্ঠে হা হা ক'রে হেসে উঠল,—এখনও এক বছর বৌ মরেনি!

চিন্তিতভাবে রসময় বললে, মেয়ে-টেয়ে ঠিক হয়েছে নাকি হে?

—হয়নি। কিন্তু হ'তে কতক্ষণ? কিন্তু আমি বলছিলাম...

রসময় একটুক্ষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা ক'রে রইল। কিন্তু সে যে কি বলছিল তা আর বললে না। অগত্যা রসময় চিন্তিতভাবে

পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করলে। মনে মনে স্থির করলে, যদিই বিকেলে কাঞ্চনপুর যেত, এ সংবাদ শোনার পর আর যাওয়া আর হতেই পারে না। রাত্রিটা শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে হবে।

রান্নার বিষয়ে দু'জনেই সমান পরিপক্ক। সুতরাং স্থির হয়েছিল, ওবেলার ভাত এবং মাছের টক থাকবে। রাত্রে ডালের প্রয়োজন নেই। শুধু মাছের ঝোল হলেই হবে। সুতরাং রান্নায় হাঙ্গাম কম। হারাণের উৎসাহের শেষ নেই। বিকেলে রসময়কে নিয়ে বেরুল মাঠ দিয়ে। তার জমিগুলো সবই খুব উৎকৃষ্ট। তাতে তার পিছনে যত্নও করে যথেষ্ট। সুতরাং ফসলও হয়েছে অপর্যাপ্ত। জমির লকলকে ফসলগুলোর দিকে চেয়ে তার মনে খুশী আর ধরে না। আলের সঙ্কীর্ণ পিছল পথ সে যেন নেচে নেচে চলতে লাগল। তার সঙ্গে অনর্গল বকুনি। কিন্তু পিছনে চলেছে রসময় মুখ নীচু ক'রে। সে বাউল ফকির। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুরই উপর তার লোভ নেই। সঞ্চয়েরও স্পৃহা নেই। মাঠভরা এই অপর্যাপ্ত সবুজ ফসলের মর্যাদা সে বুঝবে না। দীর্ঘ যন্ত্রনার শেষে সন্তানের মুখ দেখে প্রসূতির মনে যে হিল্লোল ওঠে, তার অনুভূতি শুধু প্রসূতিই জানে। ঘন নীল আকাশের নীচে গাঢ় সবুজ ধানের পাতাগুলো বাতাসে যখন নাচে, তখন কী আনন্দ চাষীর মনে জাগে, সেও শুধু চাষাই জানে। কবির যেমন সৃষ্টি কাব্য, তার 'পরে তার দরদের শেষ নেই,—চাষীর সৃষ্টি তেমনি ফসল, তারও 'পরে তার দরদের শেষ নেই। কবির সৃষ্টি মেটায় অন্তরের ক্ষুধা, চাষীর সৃষ্টি মেটায় বাহিরের ক্ষুধা। কিন্তু এত কথা হারাণ বোঝে না। তার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত। এর কারণ খোঁজার কথা তার মনেও হয়নি।

সে বলছিল, মা-লক্ষ্মী এবার ভালোই আসবেন মনে হচ্ছে।

ধান ওদের কাছে শুধু ধান নয়, মা-লক্ষ্মী স্বয়ং। ধান্যরূপে চাষীর ঘরে ঘরে তাঁর আবির্ভাব। তারও ঘটা-পটা আছে।

রসময়ের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে হারাণ আবার বললে, তোমাদের ওদিকে কেমন?

—ভালোই।

—ভালো তো বটে ভাই, কিন্তু ঝোড়া কাটার নাম ক'রে সর্বনাশ করছে। তোমাদের ওদিকেও আছে তো?

আছে কি না রসময় সঠিক জানে না। সকালে উঠে সে ভিক্ষেয় বেরোয়, দুপুরে ফেরে। গ্রামের কোনো লোকের কাছে ওঠা-বসাও তার নেই। বললে, কি জানি ভাই। নেই কি আর!

হারাণ হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, ভালো লোক! গাঁয়ে থাক, আর গাঁয়ের খবর রাখ না?

লজ্জিতভাবে রসময় বললে, কখন রাখি বল? সকালে ভিক্ষেয় বেরুই, ফিরতে ...

—আরে, পাঁচজনের সঙ্গে দেখাও তো হয়!

—তাও হয় না।

হারাণ বিস্মিতভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে রসময়ের দিকে চাইলে। বললে, বল কি হে! পাড়ার লোকের সঙ্গেও দেখা হয় না?

—না ভাই, আমি একাই থাকি। ওই ছেলে-ছোকরা দু' পাঁচজন যা আসে দয়া ক'রে, তাদেরই সঙ্গে যা একটু গল্পগুজব হয়।

হারাণ যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

রসময় বলতে লাগল, কি দরকার ভাই! আমার জমি-জায়গাও নেই, ও সব করার ইচ্ছাও নেই। কি হবে ওসব কথায় থেকে? তার চেয়ে একবেলা দু'টো ভিক্ষে ক'রে নিয়ে আসি, আর মহানন্দে রাধারানীর নামগান করি।

কিন্তু এমনিভাবে কারও যে সত্যি সত্যিই দিন কাটতে পারে এ যেন হারাণ তথাপি বিশ্বাস করতে পারছিল না।

অবশেষে রসময় বাধ্য হয়ে বললে, ভাই, গুরুর নিষেধ আছে।

হারাণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কেন? মানুষের সঙ্গে মানুষ আবার না মেলামেশা ক'রে থাকতে পারে?

—আমি তো থাকি।

—তাই তো বলছি হে।

রসময় একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, গৃহীর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে মনে গৃহের বাঞ্ছা হয়।

গুরুমুখে যেমন শুনেছিল রসময় তেমনি শুদ্ধ ভাষাই ব্যবহার করলে। বললে, আজ মনে হবে দু' বিঘে জমি কিনি। কাল এক জোড়া হালের বলদ কেনার ইচ্ছে হবে। তারপরে তৈরি কর একটা গোলা। আরও কেনো জমি। কে জমির আল কেটেছে তার সঙ্গে কর দাঙ্গা।

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, যা বলেছ।

পশ্চিমের পড়ন্ত রৌদ্র মায়ের হাসিটির মতো মাঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। আখের জমির নীচে ক্রমশঃ অন্ধকার জ'মে আসছে। কোথাও উঁচু পাড়ের বিষণ্ণ ছায়া এসে পড়েছে কোলের জমি ক'খানির উপর। দূরের আমবাগানটি আলো-ছায়ায় ছবির মতো বোধ হচ্ছে। তার পিছনে অস্ত যাচ্ছে রক্ত-রবি। পশ্চিম দিগন্তে বহুবর্ণের মেঘ-গুলোকে স্বল্পতোয়া নদীটির মতো দেখাচ্ছে। পাখীরা ঝাঁক বেঁধে চলেছে বাসার দিকে।

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, মিথ্যে নয়, সকলের চেয়ে বেশী টান মাটির টান।

রসময় উৎসাহের সঙ্গে বললে, এই কথা! মানুষ বাপ-মা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সব ছাড়তে পারে, পারে না চার আঙুল মাটি ছাড়তে।

হারাণ মাথা দুলিয়ে হেসে বললে, আমি জানি কি না! আমার কি আছে বল দেখি? বৌটা গেল ম'রে। ছেলেমেয়ে দু'টোকে পাঠিয়ে দিয়েছি মামার বাড়ি। সে সব সইল। কিন্তু এই জমি

ক'খানা ফেলে এক পা কোথাও যাবার উপায় নেই! তা মা-লক্ষ্মী এবার ভালোই হয়েছেন, কি বল?

—ভালো বৈ কি!

—এই কথা! চল এবার ফেরা যাক। গিয়ে আবার ঘাটজালে তু'টো মাছ ধরতে হবে।

রসময় বললে, প্রভু বলেছেন:

'কৃষ্ণ! তোমার হঙ যদি বোলে একবার
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।'

একবার যদি বলা যায় হে কৃষ্ণ তোমার··

হারাণ তাড়াতাড়ি বললে, আহা! তা আর নয়! বলে·

হারাণের কথা আর শেষ হ'ল না। উঁচু ডাঙায় একটি শঙ্খচিল ব'সে ছিল। এদের সাড়া পেয়েই হোক, অথবা আর আহার প্রাপ্তির আশা নেই ভেবেই হোক, সে পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে গেল। হারাণ তাড়াতাড়ি হাত জোড় ক'রে তাকে প্রণাম করলে।

প্রণাম শেষ ক'রে বললে, শহর-বাজারে এখন কত সামিগ্রি পাওয়া যায়,—ফুলকপি, বাঁধাকপি,—এ পোড়া দেশে তার চিহ্ন দেখতে পাবে তুমি? সবাই যখন খেয়ে এলে যাবে, তখন উঠবে এখানে। তোমার ঘাটজাল ফেলা অভ্যাস আছে?

—না ভাই।

—কিছুই পার না তো সংসারে এসেছ কি জন্যে?—হারাণের উচ্চহাস্যে একটা বক চমকে উড়ে পালাল। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললে, আজ রাত্রে কিন্তু গান শোনাতে হবে, তা ব'লে দিচ্ছি।

—বেশ তো! —রসময় হাসলে।

—একটা-তু'টো নয়, অনেকগুলো। যতক্ষণ না ঘুম আসছে।

—ঘুম এলে?

—তাতেও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আমার ঘুম তো জান না? কানের কাছে ঢাক বাজালেও ভাঙবে না। ঘুম ছিল আমাদের বাড়ির ওদের।

গুলো কি মড়ার মতো ঘুমুল। কিন্তু কোথাও একটু কিছু ঠুক করেছে কি অমনি জেগে উঠেছে।

রসময় গম্ভীরভাবে বললে, ওরা মায়ের জাত কি না। ওদের ঘুম পাতলা না হ'লে ছেলে বাঁচে কি ক'রে?

—যা বলেছ।

রাত্রে আহারাদির পরে রসময় সত্যি সত্যিই অনেকগুলো গান গাইলে। একে তার সুমধুর কণ্ঠস্বর, তাতে নিস্তব্ধ রাত্রি। হারাণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল।

অবশেষে হাই তুলে বললে, তুমি সেই গানটা জান?

—কোনটা?

—তবেই তো মুশকিল করলে। গান আমার কিছুতে মনে থাকে না। কি ভালো গানখানা, অনেকদিন আগে শুনেছিলাম।

রসময় বললে, আচ্ছা আর একখানা শোন:

আজগুবি এক কথা শুনে
আমার লাগে ভয়।
ভাইরে, অলক্ষোতে মানুষ আছে
কথ্যা মিথা নয়॥

সকাল বেলায় চার পায় হাঁটে,
দুপুর হ'লে দু'পা ছাঁটে,
বেলা বৈকাল হ'লে তিন পা ছেঁটে
দেশে চ'লে যায়॥

গঙ্গাস্নানে হয় সর্বনাশ,
বামুন মেরে স্বর্গেতে বাস,
ভাইরে, গুরু মেরে ধর্মের প্রকাশ
ধর্মের পরিচয়॥

আমি দেখলাম চাঁপাকলির ঘাটে
দু' পায়ে তিন জনা হাটে,
ভাইরে, পথে-ঘাটে দেখা হ'লে
মদন ফকির কয় ॥

হারাণ বললে, বাঃ! বাহারের গলা তোমার! শুনতে শুনতে প্রাণটা কেমন আনচান ক'রে ওঠে।

উত্তরে রসময় শুধু একটু হাসলে।

হারাণ হঠাৎ উঠে ব'সে বললে, 'দু'পায়ে তিনজনা হাটে'। অ্যাঁ? সমিস্যে তো বড় মন্দ নয় হে! কিন্তু মানেটা কি হ'ল?

রসময় শুধু মুখ টিপে হাসলে।

হারাণ একটা ঠেলা দিয়ে বললে, হাসলে হবে না। সমিস্যে পুরণ ক'রে দাও।

রসময় তথাপি হাসে। অবশেষে হারাণের জেদাজেদিতে বললে, তা পারব না ভাই, গুরুর নিষেধ আছে।

হারাণ বিরক্ত হয়ে বললে, ভালো গুরু পেয়েছ দেখছি। সবেতেই তার নিষেধ আছে।

রসময় হেসে বললে, 'সাধন ভজন কথা না কহিও যথা তথা'।

—ও! ভারি আমার সাধন ভজন! ও তো হেঁয়ালি।

রসময় শুধু হাসলে।

হারাণ আবার বললে, আহারটা আজ বড় গুরুতর হয়ে গেছে। অনেকদিন এমন খাইনি। আর কিছু তো নয় হে, এই হাত পুড়িয়ে খাওয়ার কষ্টটা সয় না! চাষের খাটুনি খেটে এসে আর কি তা পারা যায়? তুমিই বল দেখি!

—তা বটেই তো।

—তাই মাঝে মাঝে ভাবি, দূর হোকগে, বিয়েই একটা ক'রে ফেলি। হাত পুড়িয়ে রান্নাও ঘুচবে, ছেলেমেয়ে দু'টোও কাছে থাকবে। আবার ভাবি, বুড়ো বয়সে আবার একটা গলগ্রেরো

জোটাব। তার চেয়ে এমনি ক'রে ভগমানের নাম করতে করতে বাকি ক'টা দিন দিব্যি কাটিয়ে দোব। তুমি কি বল?

রসময় বললে, ভারি মুশকিলের কথা বটে। কিন্তু বিনোদিদির কি হয়েছিল তা তো বললে না।

হারাণ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর কোনো রকমে জড়িতকণ্ঠে বললে, জলে ডুবে মারা গেছে।

—হঠাৎ?

—হুঁ। আপ্তহত্যে করেছে।

—আপ্তহত্যে! ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছিল নাকি?

দু'জনে অন্ধকার ঘরে পৃথক বিছানায় শুয়ে। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। হারাণ ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, কিংবা আদৌ উত্তর দিলে না, কিছুই বোঝা গেল না।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রসময় বললে, তেমন লোক তো সে নয়। লাস পাওয়া গিয়েছিল?

—না।

—তবে? সে তো কোথাও গিয়ে উঠতে পারে।

হারাণ যেন বর্শার খোঁচা খেয়ে লাফিয়ে উঠল, শালারা সেই কথা তোমায় বলেছে বুঝি? এক শালার মিত্যু আমার হাতে নাচছে দেখতে পাচ্ছি।

রসময় ভয়ে বিস্ময়ে প্রথমটা হতবাক্ হয়ে গেল। তা'রপরে তাড়াতাড়ি বললে, না, না। কেউ বলেনি, আমি···

—আর কেউ বলেনি! আমি কি বুঝি না ভেবেছ? তবু ভাবি, বলুক যার যা খুশি। আমি তো জানি সে সব মিথ্যে। নইলে ও-ক'টা লোক তো আমার কাছে মশা।

হারাণ অবসন্নভাবে শুয়ে পড়ল।

রসময় ওকে একটু শান্ত হবার অবসর দিয়ে বললে, কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেও তো উঠতে পারে।

হারাণ বিরক্তভাবে বললে, তাকে কি আমার চেয়েও তুমি বেশী জান রসময়? আমার কষ্ট হবে ব'লে সে একবেলার বেশী দু'বেলা বাপের বাড়িতে থাকত না। আর এতদিন সে কার বাড়িতে ···

কথা আর সে শেষ করতে পারলে না। কান্নায় স্বর ভেঙে এল।

একটু পরে বললে, মেয়ে লোকের চরিত্রি ও-বয়সে খারাপ হবে না কেন, হয়। ওদের চরিত্রির কথা দেবতারা বলতে পারে না, মানুষ তো কোন ছার। আবার সময়কালে সামলেও নেয়। কিন্তু পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার মেয়ে ও নয়। ওর সম্ভ্রমজ্ঞান কত? নদীতে ডুবে মরবে তবু পরের বাড়ি গিয়ে পাতা পাড়বে না। আমি না হয় বুড়ো-হাবড়া হয়েছি, আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু ছেলেমেয়ে বাড়ি-ঘরের ওপর ওর মায়া কত! এ-বাড়ি ছেড়ে ও একটা দিন কোথাও থাকতে পারবে? আমি কি আর সাত দিক ভাবিনি? না ভেবেই ওর ছেরাদ্দ করেছি? ও যদি না আপ্তহত্যে ক'রে থাকে তো আমার নামে কুকুর পুষো। এই কথা তোমাকে ব'লে দিলাম।

উত্তেজনায় হারাণ হাঁপাতে লাগল।

একটু পরে রসময় বললে, তবু একবার খোঁজা উচিত ছিল।

হারাণ আবার ছিটকে উঠে বসল। বিরক্তভাবে বললে, তবু সেই এক কথা! আবার খুঁজে লাভটা কি? পষ্ট বুঝতে পারছি···হু:।

ভয়ে ভয়ে রসময় বললে, তা ঠিক।

সে রাত্রে আর কোনো কথা হ'ল না। হারাণের অবস্থা দেখে সে আর কিছু বলতে সাহস করলে না। কি জানি, যে গোঁয়ার হয়তো পট্ ক'রে কিছু বলে বসবে। হঠাৎ এক ঘা লাঠি বসিয়ে দেওয়াও ওর পক্ষে বিচিত্র নয়। হারাণও যেন এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। রসময়ের একবার লোভ হ'ল বিনোদিনীর অস্তিত্বের কথা ফাঁস ক'রে দেয়। কিন্তু ললিতার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছু বলা সমীচীন বোধ করলে না। কি জানি, যদি হিতে বিপরীত হয়।

*   *   *

সকালে হারাণের মুখ দেখে রসময় বিস্মিত হয়ে গেল। সে মুখে গত রাত্রের দুঃখ কিংবা ক্রোধ, কিংবা কোনো রকম দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই। হয়তো রাত্রের কথার কিছু তার মনেও নেই। সে রসময়ের ঝুলি চেপে ধ'রে কিছুতেই ছাড়বে না,—সকালটাও থেকে যেতে হবে। এমনকি ললিতার জন্যে রসময়ের মন কেমন করছে, এ নিয়েও গোটাকতক রসিকতা ক'রে ফেললে। অবশেষে রসময় যখন কিছুতেই থাকবে না, তখন সাশ্রুনেত্রে বিদায় দিলে। রসময় অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে চলল, এই লোকটির রাগতেও যতক্ষণ, কাঁদতেও ততক্ষণ। এমন বুড়ো বয়সের শিশু বড় একটা দেখা যায় না।

গ্রামের কোল ছাড়িয়ে একটু দূরে যেতেই তার মনে হ'ল সম্মুখের অশ্বত্থতলায় কে যেন একটি ছোকরা ব'সে ছিল, তাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। গায়ে একটি মাত্র গেঞ্জি। পরনের কাপড় কোমরে বেড় দিয়ে বাঁধা। কিন্তু সবই ধবধবে ধোয়া। পায়ে মান্দ্রাজি চপ্‌পল।

অশ্বত্থতলার নীচে দিয়েই রাস্তা। সেখানে আসতেই ছেলেটি একটি ছোট নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, আপনিই কি রসময়বাবু?

রসময় একটু বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। এই ছেলেটিকে যেন ইতিপূর্বে কোথাও সে দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে ঠিক স্মরণ করতে পারলে না।

বিনীতভাবে বললে, আজ্ঞে না বাবু, আমি শুধু রসময়।

ছেলেটি হেসে বললে, আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি তারাপদ। আপনার স্ত্রী আমাকে চেনেন।

—তারপরে?

—আমি জানি আপনার বাড়িতে বৌদি আছেন।

—আপনার বৌদি ?

—হ্যাঁ! মানে হারাণদা'র স্ত্রী।

রসময় একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, তিনি তো মারা গেছেন শুনে এলাম।

মাথা নেড়ে তারাপদ বললে, না যাননি। আমি জানি, তিনি আপনার ওখানে আছেন। শুনুন, আমি আপনার জন্যেই ভোর থেকে এখানে অপেক্ষা ক'রে আছি। বহু চেষ্টা ক'রেও কাল দিনরাত্রির মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ ক'রে উঠতে পারিনি।

রসময় বললে, আমি তো সমস্তক্ষণই হারাণদা'র ওখানে ছিলাম। কেবল ···

বাধা দিয়ে তারাপদ গড়গড় ক'রে ব'লে চলল, তা ছিলেন, কিন্তু ওখানে আমার সুবিধে হ'ত না। শুনুন, আপনি বড়বৌ একটা কথা বলবেন যে, আমি তার সঙ্গে একটিবার দেখা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

—তবে চলুন না কেন একবার। দূর তো বেশী নয়।

—তা নয়। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন একথা না জানতে পারলে আমি যেতে পারি না।

—কি করে তিনি জানাবেন ?

—একটা লাইন লিখলেই জানতে পারব। এই আমার ঠিকানা।

তারাপদ একটুকরো কাগজ ওর হাতে দিলে।

রসময় কাগজখানা অনাবশ্যক হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তার কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল। হারাণের কথা শুনেও সে বিশেষ কিছু বুঝতে পারেনি। এ ছোকরাই বা ভোর থেকে এই ক'টি কথা বলবার জন্যে কেন অপেক্ষা ক'রে আছে, কি তার অপরাধ, বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করার জন্যেই বা ওর অত ব্যাকুলতা কেন, কিছুই বুঝে পেলে না। বরং যত ভাবতে লাগল, ততই তার

মনের মধ্যে একখানা মেঘ ক্রমশঃ কালো হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু মুখে সে কিছুই প্রকাশ করলে না। কাগজের টুকরাটি ধীরে ধীরে ঝুলির মধ্যে পুরে শুধু বললে, তিনি বোধ হয় চিঠি লিখতে পারেন না।

—না। কিন্তু আপনি লিখে দিতে পারেন।

রসময় একটু হেসে বললে, তাই হবে।

তারাপদ নমস্কার ক'রে চ'লে গেল। রসময়ও গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে পথ চলতে লাগল।

॥ চার ॥

আমবাগানের কাছে এসে পৌঁছতেই রসময়ের মন খুশীতে ভ'রে উঠল! তার মনে হ'ল অনেকদিন প্রবাসবাসের পর নিজের কুটিরে ফিরে এসে মন যেন সুস্থ হ'ল। বাঘভেরেণ্ডার বেড়া পেরিয়ে ঝকঝকে উঠানে পা দিয়েই রসময় হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠল :

সেই তো পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ॥

ললিতা উঠানের দিকে পিছন ফিরে ব'সে একটা কুলোয় চালের কাঁকর বাছছিল। রসময়ের গান শোনামাত্র সে উচ্চকিত হয়ে উঠল। গান দিয়ে গানের উত্তর দেওয়া হ'ল ওদের রীতি। ললিতা ঘাড় বেঁকিয়ে পাখীর মতো কলকণ্ঠে গেয়ে উঠল :

না খুঁজলুঁ দূতী, না খুঁজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥

ঝুলি-ঝম্পা নামিয়ে রসময় উঁচু দাওয়ায় পা মেলে বসল। তার হাঁটু পর্যন্ত ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে। ললিতা ঘটিতে ক'রে জল নিয়ে এসে ওর পা ধুইয়ে দিলে, মাথার চুলে ক'রে পা মুছিয়ে দিলে। হুঁকোয় নতুন জল পুরলে। তামাক সেজে এনে হুঁকো ওর হাতে দিয়ে চোখে মুখে হাসির ঝলক ছড়িয়ে আবার গাইলে :

অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলী দূতী।
সুপুরুখ-প্রেম ঐছন রীতি॥

অর্থাৎ হারাণের অবস্থা ও জানতে চাইলে। জানতে চাইলে রসময়ের দূতী-গিরির ফলাফল।

রসময় শুধু একটু হাসলে। হেঁকে বললে, কই গো বিনোদিদি, তোমার মুখখানা একবার দেখি ?

—এ কালা মুখ আর দেখে কাজ নেই।

বিনোদিনী একখানা কালো তেলচিট কাপড় প'রে সামনে এসে দাঁড়াল। ছেঁড়া কাপড়, তার ফাঁক দিয়ে মাথার চুল দেখা যাচ্ছে।

রসময় হেসে বললে, কালা মুখ আবার কি ক'রে হ'ল ? বেশ তো ছিল মুখখানি! হঠাৎ আমাকে দেখে হাঁড়ির মতো হ'ল নাকি ?

মাথা নেড়ে বিনোদিনী বললে, দেখ না কাণ্ড! চাল তো নেবে চার আনার, কথা শোনাবে এক ঝুড়ি।

—ওঃ! তাই। আমি ভাবলাম বিরহে। যাকগে, শোন। তুমি ইয়েকে জান···

ঘাড় বেঁকিয়ে বিনোদিনী বললে, জানি।

—তারাপদকে ?

বিনোদিনীর সমস্ত দেহ অকস্মাৎ কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ললিতারও। সেও রুদ্ধ নিশ্বাসে রসময়ের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল।

কোনোদিকে না চেয়ে রসময় বলতে লাগল, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে ছোকরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তুমি তাকে ক্ষমা করেছ, এই কথাটি জানতে পারলেই সে এসে দেখা করবে।

অকস্মাৎ সমস্ত বাড়িটি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ললিতার মুখে কথা নেই। বিনোদিনীর সাড়া নেই। রসময়ও নিঃশব্দে পায়ের নখ খুঁটতে লাগল।

খানিক পরে ললিতা বললে, তাকে সঙ্গে ক'রে আনলে না কেন ?

মাথা তুলে রসময় বললে, আনতে চাইলাম, এল না। ওই তো বললাম, কি না কি সে দোষ করেছে। তার ক্ষমা না পেলে সে কিছুতে আসবে না। ভালো কথা, তার ঠিকানাও দিয়েছে।

রসময় ঝুলি থেকে কাগজের টুকরোটা বের ক'রে বিনোদিনীর দিকে এগিয়ে দিলে। বললে, এই ঠিকানায় চিঠি দিলেই সে আসবে।

কাগজখানার দিকে বিনোদিনী শূন্য দৃষ্টিতে একবার চাইলে মাত্র। তুলে নিলে না।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি ওদিকে গিয়েছিলে? কোথায় দেখা হ'ল তার সঙ্গে?

—রাস্তায়।

একটি কথা জানবার জন্যে বিনোদিনীর মন আথাল-পাথাল ক'রে উঠল। তার হাবল-মেনীর কোনো খবর তারাপদ ঠাকুরপো বলেনি? তার স্বামীর কোনো খবর? কেমন করে হারাণের দিন চলছে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই কি সে বলেনি? কিন্তু বিনোদিনীর মন বুঝি পাথর দিয়ে গড়া। অনেকখানি হেলে দুলে অবশেষে টাল সামলে নিলে।

রসময় বললে, ওকে কি আসবার জন্যে চিঠি লিখে দোব?

—না।

বিনোদিনী সোজা ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢুকল। একটু পরেই ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার শব্দ শুনে রসময় বিস্মিত দৃষ্টিতে ললিতার দিকে চাইলে।

ললিতা হঠাৎ বিরক্তভাবে বললে, অমন ক'রে দেখছ কি?

রসময় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হেসে বললে, বিনোদিদি যেন মানুষ নয়, ধানভানা কল। সংসারে যেন ধানভানা ছাড়া মানুষের আর কোনো কাজই নেই।

রসময় হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

ললিতা চুপ করে ব'সে ছিল। রসময় দৃষ্টির বাইরে যেতেই টুপ ক'রে কাগজখানা তুলে নিয়ে চালের বাতায় লুকিয়ে গুঁজে রেখে রান্নাঘরে চাল বাছতে বসল।

দুপুরে বিনোদিনী যখন নদীর ঘাটে গেল তখন রসময় চুপিচুপি এসে বসল ললিতার পিছনে।

—একটু আগুন দাও তো?

আগুন দিয়ে ললিতা ওর দিকে সমুখ ফিরে বসল। জিজ্ঞাসা করলে, কি বুঝে এলে, বল।

—কিছুই না।—রসময় এক গাল হেসে বললে, দেখে এলাম অনেক, শুনে এলাম অনেক—কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।

ললিতা ভ্রূভঙ্গি ক'রে বললে, যাও, আর ন্যাকামি করতে হবে না।

—সত্যি গো। বললে, বিনোদিনী নদীর জলে ডুবে মরেছে। হাবল-মেনী মামার বাড়িতে আছে। আর হারাণ একবেলা রাঁধে, পাঁচবেলা খায়।

—আর?

—আর পাঁচজনে ধরেছে তাকে বিয়ের জন্যে।

রসময়ের দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মারতে লাগল।

ললিতা ঠোঁট টিপে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তার পরে?

—বলছিল, এই বয়সে আবার বিয়ে করে! বউ মরেছে এখনও এক বছরও হয়নি। তবে, রেঁধে খেতে বড় কষ্ট হয়, মেয়েটার জন্যেও বড় মন কেমন করে। সেইজন্যে মাঝে মাঝে মনে হয়···ঘর-সংসারও থাকে···আমার মত জিজ্ঞাসা করল।

ললিতা মাথা নীচু ক'রে কি যেন ভাবতে লাগল।

রসময় আরও একটু স'রে এসে সুর ক'রে গাইলেঃ সুপুরুখ-প্রেম ঐছন রীতি।

ললিতা তথাপি চুপ ক'রে রইল। একটু পরে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, বিনোদিনী কেন পালিয়ে এল, তোমার কিছু মনে হয় না?

রসময় সোজা বললে, না।

একটু পরে বললে, হ'ত, যদি ওকে না চিনতাম, আর আমার আখড়ায় না উঠত।

—কি মনে হ'ত?

বিব্রতভাবে রসময় বললে, সে কথা আর কেন জিগ্যেস করছ ?

—বলই না।

রসময়কে বলতে বাধ্য হ'তে হ'ল, গৃহত্যাগ করেছে।

—কার সঙ্গে ?

রসময় তাড়াতাড়ি বললে, সে কথা আমি কি ক'রে বলব ললিতা ? ও-কিছু সত্যি সত্যি গৃহত্যাগ করেনি,—আমিও ওদের গাঁয়ের কাউকে চিনি না।

উনানে ভাত ফুটছে টগবগ ক'রে। তার পাশে দু'জনে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

হারাণ বলেছিল, মেয়েলোকের চরিত্রি ও-বয়েসে খারাপ হবে না কেন, হয়। তাই ব'লে পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার মেয়ে ও নয়,—ওর সম্ভ্রমজ্ঞান কত ? রসময়ের মনে হ'ল, এই সামান্য ক'টি কথায় যেন বিনোদিনীর সমগ্র রূপ সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সুনিবিড় ভালবাসার সঙ্গে সুগভীর শ্রদ্ধা না থাকলে স্বামী কখনও স্ত্রীকে এমন অন্তরঙ্গ ক'রে চিনতে পারে না। কিন্তু বিনোদিনীর অনবসর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাবের অবকাশই বা কোথায় ? বিনোদিনীর পাথরের মতো চিত্ত জয় করতে পারে এমন ভাগ্যবান ব্যক্তিই বা ওদের গ্রামে কে থাকতে পারে ?

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, ওই ছোকরাটি কে বলত ? বেশ বাবু বাবু মনে হ'ল। কথায় বার্তায়···

ললিতার সমস্ত ইন্দ্রিয়ে যেন টান বাজল। বললে, কোন ছোকরা ?

—ওই যে কি ঠাকুরপো বললে। মাঝ-মাঠে আমার জন্যে ভোর থেকে অপেক্ষা ক'রে ছিল।

—কেন ?

—তাই শুধুচ্ছি।

—গ্রাম-সম্পর্কে ওর ঠাকুরপো হয়। বেশ ভালো ছেলে। কলেজে পড়ে। কেন, তোমার কিছু সন্দেহ হয় নাকি ?

ললিতার মুখ অকস্মাৎ অন্ধকার হয়ে উঠল। কেন, কে জানে?

এমন সময় ভিজে কাপড় সপসপ করতে করতে ঘড়া কাঁখে বিনোদিনী এল।

সহাস্যে বললে, কি হচ্ছে ছ'জনে মুখোমুখি ব'সে?

রসময় কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, একটু সুখ-দুঃখের কথা কইছিলাম দিদি।

—কও। কিন্তু যতই কর, সন্ধ্যের আগে আর সূয্যি ডুবছে না।

বিনোদিনী কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢুকল। রসময়ও হুঁকো নিয়ে নিমতলায় বেদীর উপর উঠে এসে নীরবে ধূমপান করতে লাগল।

বিকেলে ললিতা গেছে নদীর ঘাটে গা ধুতে। বিনোদিনীর তখনও কাজ শেষ হয়নি। সামান্য বাকি আছে। এইটুকু সেরেই সেও যাবে ঘাটে। সূর্য সবে পাটে বসেছে। রসময় একটু আগে পর্যন্ত কি যেন গুনগুন করছিল, তারও সাড়া নেই। বোধ হয় বাইরে গেল। এমন সময় ক্ষান্তমণি এল।

—রাঙা বৌ আছ না কি গো? না বাইরে গেলে?

ঢেঁকিশাল থেকে বিনোদিনী সাড়া দিল, নেই গো। বাইরে গেছি।

হাসতে হাসতে ক্ষান্তমণি ঢেঁকিশালের দাওয়ায় এসে ধপ ক'রে বসল। ক্ষান্তমণির বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে যায়নি। কিন্তু মোটা মানুষ, এই বয়সেই অথর্ব হয়ে পড়েছে। মাথার চুলের বারো আনায় পাক ধরেছে। চোখের নীচে চামড়া কুঁচকে এলেও তার চটুলতা এখনও যায়নি। ক্ষান্তমণি বাল-বিধবা। তার নিজের যথেষ্ট বয়স না হ'লেও স্বামীর সম্পর্কে গ্রামের যত ছেলেমেয়ের সে ঠাকমা। হাসি ছাড়া তার কথা নেই। আর সকল ছেলেমেয়ের একটা ক'রে নতুন নাম সে রেখেছে। বিনোদিনী তার রাঙা বৌ।

—কি গো ঠাকমা, এখনও গা ধুতে যাওনি ?

--আমাদের আর গা-ধোয়া চুল বাঁধার কি তাড়াতাড়ি আছে বোন! সে বয়স তোমাদের। চার আনার দাও দেখি। —ক্ষান্তমণি ঝনাৎ ক'রে একটা আধুলি ফেলে দিয়ে বললে,—আধুলিটা দেখে নাও ভাই। সেদিনকার চার আনা, আর আজকের চার আনা।

আধুলিটা তুলে নিয়ে বিনোদিনী হেসে ফেললে, মুখের সামনে বলছি না ঠাকমা, কিন্তু এ গাঁয়ের অনেকের সঙ্গে তো কারবার করলাম। কিন্তু তোমার মতো এমন ক'রে বাড়ি ব'য়ে পয়সা আর কেউ দিয়ে যায় না। ধারে কাউকে সেইজন্যে দিইও না ঠাকমা।

ঠাকমা হেসে বললে, তুমি পয়সা পাবে রাঙা বৌ, দোব না ? গরজ ক'রে চাল যখন নিয়ে গেছি, তখন গরজ ক'রে পয়সাও দিয়ে যেতে হবে। আমি ভাই এই বুঝি। তা তুমি ভালোই বল, আর মন্দই বল, যা বলবে বল।

চার আনার চাল সেরে ক'রে মেপে ক্ষান্তমণির আঁচলে ঢেলে দিয়ে বিনোদিনী বললে, মন্দই বলব ঠাকমা।

—তাই বল ভাই, যা তোমার মন চায়।

হঠাৎ বিনোদিনীর মাথার দিকে চেয়ে ক্ষান্তমণি বললে, ও কি রাঙা বৌ! তুমি এখনও চুল বাঁধনি কেন ?

—সময় পেলাম না ঠাকমা।

—না, সময় আবার পেলে না! বলে, যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না ? কি করেছ বল দেখি ? অমন যে মেঘের মতো চুল তাতে যেন জট পড়েছে! অমন করতে নেই রাঙা বৌ।

বিনোদিনী হেসে বললে, কি হয় ?

—কি হয় জান না ? ভগমানের দেওয়া রূপের অমর্য্যেদা করতে নেই। তাতে দেবতা বিরূপ হন।

—মরণ আর কি! আমি বুড়ো মাগী, দিনরাত নটি সেজে ব'সে থাকব নাকি ?

এক গাল হেসে ক্ষান্তমণি বললে, আ মলো ছুঁড়ী! এর মধ্যে বুড়ী সাজবার সখ হয়েছে বুঝি? তাহ'লে বলি শোন— ব'লে ক্ষান্তমণি ওর কাছ ঘেঁসে এসে বলতে লাগল, সেদিন নায়েববাবু আমাকে বলছেন, মাসী ও মেয়েটি কে গো? আমি বললাম, কোন মেয়ে গো? বললেন, এই যে এখনই জল নিয়ে আখড়ায় ঢুকল? তাই ভালো! আমি বললাম, ও একটি বড় দুঃখী মেয়ে বাবু। বাবাজির আপনার লোক হয়। বড় লক্ষ্মী মেয়ে। বাবু হেসে বললেন, তা হবে না মাসী? লক্ষ্মীর মতো রূপ যে! অমন রূপ আর কখনও আমার চোখে পড়েনি মাসী। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিনোদিনী হেসে বললে, তবু চুল বাঁধি না ঠাকমা, একখানা ধবধবে কাপড় পরি না।

ক্ষান্তমণি স্তিমিতপ্রায় চোখে একটা কটাক্ষ হানবার চেষ্টা ক'রে বললে, কি বলে জানিস?

—জানি। আমিও ভাবছিলাম, বাবুর একটি আপনার লোক পাই তো আমিও যা জানি বলি।

ফিসফিস ক'রে ক্ষান্তমণি বললে, আর বলতে হবে না বোন, তোর জন্যে বাবু পাগল হয়ে উঠেছে।

বিনোদিনী হেসে বললে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি ঠাকমা, কিন্তু সেই সঙ্গে, আমি গেরস্তর মেয়ে, আমাকেও কেন পাগল করে?

ক্ষান্তমণি আহ্লাদে একেবারে ওর গায়ের উপর ঢ'লে পড়ল। ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বললে, তবে যে কে বলে রাঙা বৌ রস জানে না! ও বাবা, এ যে রসের সাগর!

বিনোদিনী ওর ছোঁয়া লাগতেই চট্ ক'রে উঠে স'রে দাঁড়াল। বললে, রসের এই শেষ নয় ঠাকমা। তা সে তোমাকে আর দিলাম না। তোমার বাবুর জন্যে ওইখানে তুলে রেখেছি।—ব'লে, ঘরের এক কোণে ঠেস দেওয়া মুড়ো ঝাঁটাটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে।

ক্ষান্তমণি হাসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। ওর মুখে কে যেন চকিতে কালি লেপে দিলে! বিনোদিনীর জ্বলজ্বলে চোখের দিকে চেয়ে ভড়কে স্খলিতকণ্ঠে বললে, আমি তো তা বলিনি, তা বলিনি।

ক্ষান্তমণি আর দাঁড়াল না। পিছন ফিরে চাইলেও না। পোঁ পোঁ ক'রে পালাল।

বিনোদিনী একটা নিশ্বাস ছেড়ে স্তব্ধভাবে ব'সে পড়ল। মুখে সে জোর করলে বটে, কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে তার জোর করার কি অধিকার আছে? এখানে কি হারাণ আছে, যে একা একশো লোকের মোহড়া নিতে পারে? লম্পটের কুৎসিত দৃষ্টির হাত থেকে এখানে বাঁচাবে কে? রসময় নিরীহ দুর্বল লোক। মানুষের সঙ্গে কলহ করার তার প্রবৃত্তিও নেই, শক্তিও নেই। তার উপর নির্ভর করা চলে না।

বিনোদিনীর মনে পড়ল সেই দুর্যোগের রাত্রির কথা। হারিকেনের আলোয় তার কষ্টি পাথরের মতো কালো দেহ বৃষ্টিতে ভিজে চকচক করছিল। তার দীর্ঘচ্ছন্দ বলিষ্ঠ দেহের কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালে বুকে ভরসা জাগে কত! অমন পুরুষ তো তার চোখে আজও পড়ল না! অথচ কি কোমল, সুস্নিগ্ধ মন!

—কি লো! আজ আর গা ধুতে যাবি না না:কি?

ললিতা ভিজে কাপড়ে বাড়ি ঢুকল।

বিনোদিনী শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, বেলা আর এতটুকু নেই। পশ্চিম দিগন্তে ফিকা আলো এখনও একটু রয়েছে বটে, কিন্তু পূর্ব দিকের গাছগুলোর মাথায় মাথায় যেন একটি সূক্ষ্ম কালো আবরণ ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসছে।

মিনতির সঙ্গে বললে, চল্ না ভাই, আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবি। বেলা আর নেই।

ঘাড় বেঁকিয়ে ললিতা বললে, মর্। বাড়ির নীচে ঘাট, তার আর ভয়টা কি?

—ওই আমবাগানটায় কেমন গা ছমছম করে।

—আহা! আর জ্বালাস না যা।

বিনোদিনী অত্যন্ত সকাতরে বললে, লক্ষ্মী দিদি আমার, সত্যি বড় ভয় করে! তুই না গেলে আমি কিছুতে যেতে পারব না।

ওর ভয় দেখে ললিতা বিস্মিত হয়ে গেল! বিনোদিনীকে ছেলেবেলা থেকে সে চেনে। ওর বুকে ভয় ব'লে কিছু আছে ব'লে তার জানা নেই। অথচ ওর কণ্ঠস্বর শুনে অবিশ্বাসও হ'ল না। বিরক্তির সঙ্গে বললে, ঢঙ! শীগগির চল্ তাহ'লে। আমার বলে কত কাজ!

বিনোদিনী শুধু একখানা গামছা কাঁধে নিয়ে তখনই বের হ'ল। ললিতা দেখে অবাক হয়ে গেল, বিনোদিনী হনহন ক'রে যায়, আর চারিদিকে চকমক ক'রে চায়। কোনো রকমে খলবল ক'রে কাপড়টা কেচেই তখ্খুনি উঠে পড়ল। ফেরবার সময় আমবাগানের কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি হ'ল?

—কিছু না।—ব'লে বিনোদিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ঢুকল।

ওর ভয় দেখে ললিতা হেসে বললে, মর্! সন্ধ্যে না লাগতেই পথে-ঘাটে যেন ভূত দেখছেন!

ফিসফিস ক'রে বিনোদিনী বললে, কিছু দেখলি না?

—কি আবার দেখব?

—ওই নোড়া গাছটার নীচে?

গাছটায় নোড়ার মতো আম ফলে ব'লে ওর নাম নোড়া গাছ।

ললিতা খিলখিল ক'রে হেসে বললে, আ মলো, ও-যে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল।

—তাই তো বলছি। কে মানুষ চিনতে পারলি না?

ললিতা এতক্ষণ যেন বিনোদিনীর ভয়ের কারণটা ধরতে পারলে। ভয়ে ভয়ে বললে, কে লো?

—সেই মুখপোড়া নায়েব না কে। তোকে তো বলিনি, কিছুদিন থেকে কি যে পিছু লেগেছে বোন, ভয়ে মরি।

একটু চিন্তা ক'রে ললিতা বললে, তোর পেছনে লেগেছে, তা কে বললে ?

—আজ লোক পাঠিয়েছিল যে, ক্ষান্ত ঠাকমাকে।

—তারপরে ? কি বললি ?

—কি আর বলব বোন ! ভয়েই সারা। এখানে আমাকে কে রক্ষা করবে বল্ ?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে ললিতা বললে, কেন, আমরা কি মরেছি নাকি !

বিষণ্ণ মুখে বিনোদিনী বললে, তোরা আর কি করতে পারিস বল, সে হ'ল জমিদারের নায়েব।

—বলি, লাট তো আর নয়। আসুক না, কোন মুখপোড়ার তেজ অত বেড়েছে দেখি।

—না ভাই, আমার জন্যে তোমরা আর ঝঞ্ঝাট বাধিও না।

গলা সপ্তমে তুলে ললিতা বললে, বাধাব না ! কাল সকালে সে মুখপোড়া ঘাটের মড়ার পিণ্ডি যদি না চটকাই তো আমার নাম ললিতা বোষ্টুমী নয়।—ব'লে দুমদুম ক'রে ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে। সেই থেকে ও আর কাপড় ছাড়তে সময় পায়নি।

বিনোদিনী বিব্রত হয়ে উঠল। তার জন্যে এদের সংসারে কোনো প্রকার অশান্তি আসুক এ সে চায় না। গলা ঝেড়ে বললে, কাজ নেই ভাই, তার চেয়ে আমিই বরং অন্য কোথাও উঠে যাব। আমাকে চিরকাল যে এখানে থাকতে হবে তারই বা কথা কি !

ললিতা ও-ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, সে যখন যেতে হয় যাবি। যাবি বৈ কি ! তোর বলে রাজার ঐশ্বর্যি ! তাই ব'লে ওই মুখপোড়ার ভয়ে যাবি ? এটা কি মগের মুল্লুক নাকি ?

—কি হ'ল ? কি হ'ল ? সন্ধ্যে বেলায় দু'বোনে আবার কি নিয়ে লাগল ?

রসময়ের সাড়া পেয়ে দু'জনে চুপ ক'রে গেল। বিনোদিনী উঠানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে। ললিতা বেরিয়ে

এসে দোরে-চৌকাটে জলছড়া দিলে, ঘরে-দোরে-তুলসীতলায় সাঁঝ প্রদীপ দেখালে। তারপরে রসময়ে কাছে এসে থমথমে মেঘের মতো দাঁড়াল।

—কি হুকুম ?

ললিতা এক নিশ্বাসে বললে, এখানে তো আর আমাদের থাকা চলে না।

রসময় বিস্মিতভাবে বললে, কেন ?

—সেই নায়েব মুখপোড়া বিনোদিনীর পিছনে ক'দিন থেকে লেগেছে, আজ আমি স্বচক্ষে দেখলাম।

রসময় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এখন যেন অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। কিন্তু বিনোদিনী ভয় পেয়ে গেল। ব্যাপারটা রসময়ের কাছ পর্যন্ত পৌঁছয় এ তার ইচ্ছা ছিল না। লজ্জার জন্যেও বটে, তাছাড়া ভয়ও ছিল। রসময় যতই নিরীহ, যতই দুর্বল হোক না কেন, পুরুষ মানুষ তো বটে। বাড়ির স্ত্রীলোকের অপমান কোনো পুরুষই সহ্য করতে পারে না। হয় সে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবে, নয় একটা কেলেঙ্কারি বাধাবে। এবং কেলেঙ্কারির বেশীর ভাগ কাদাই অবশেষে নিরীহ স্ত্রীলোকের গায়ে এসেই পড়ে।

ললিতা বললে, মুখপোড়ার এত বড় সাহস যে বাড়িতে লোক পর্যন্ত পাঠিয়েছিল।

ঘরের ভিতর থেকে বিনোদিনী টিপ্পনি কাটলে, বললে পাগল হয়ে উঠেছে।

রসময় একেবারে হো হো ক'রে উচ্চহাস্য ক'রে উঠল। বললে, বল কি ! একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে !

সঙ্গে সঙ্গে সুর ক'রে গাইতে আরম্ভ করলে ঃ

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু-মন জরে ॥
রাত্রি দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাঙ্।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ্ তাহাঁ উড়ি যাঙ্ ॥

ঝঙ্কার দিয়ে ললিতা বললে, গান থামাও তো দেখি। রঙ্গ ভালো লাগে না।

নিরীহভাবে রসময় গান থামিয়ে বললে, ভালো লাগে না? আচ্ছা তাহ'লে আহ্নিকের জায়গাটা ক'রে দাও।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ললিতা তাড়াতাড়ি আহ্নিকের জায়গা করতে গেল। ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে তার এ কথা মনেই ছিল না।

রসময়ের দৌত্যের ফলে বিশেষ কিছুই জানা গেল না। ললিতার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, বিনোদিনীকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পাছে তার মনে আঘাত লাগে ব'লে তাও পারছিল না। নায়েবের ভয় অবশ্য সে করে না। তারা বৈরাগী। বিষয়-সম্পত্তি নেই, বাড়ি-ঘরও নেই। এ আখড়া। জীর্ণ বস্ত্রের মতো একমুহূর্তে ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে বাধবে না। মানুষের ভয় মৃত্তিকা আর প্রাণ ছাড়তে। এই দু'টি বস্তুর উপরই তাদের বিন্দুমাত্র মমতা নেই। ভয় বিনোদিনীকে নিয়ে। সে কুলের বধূ। তার নামে বি[illegible] কলঙ্ক স্পর্শ করলেও ক্ষতি। এই ক্ষতির পরিমাণ নেই। হারাণের সঙ্গে বিনোদিনীর কিছু একটা গোলযোগ হয়েছেই। তার ফলে বিনোদিনী স্বামী-গৃহ ছেড়ে এইভাবে অজ্ঞাতবাস করছে। অত্যন্ত জেদী এবং অত্যন্ত শক্ত বলেই এ কাজ সে পেরেছে। কিন্তু পারা [illegible]চিত হয়নি। এখন ভালোয়-ভালোয় কুলের বধূ স্বামীর ঘরে ফিরে গেলে তবে সব দিক রক্ষা হয়। কিন্তু পূর্বে জানা প্রয়োজন, কি কারণে সে গৃহত্যাগ করেছে। এ সম্বন্ধে সকল সংবাদ দিতে পারে একমাত্র তারাপদ। তাকে বিশ্বাসও করা যায়, এখানে আনাও খুব সহজ। কিন্তু তার আগমন বিনোদিনী কি ভাবে নেয়, সেও একটা সমস্যা।

বিনোদিনীর কাছে তারাপদ কি একটা অপরাধ করেছে। এই কথাটা যখন থেকে সে শুনেছে, তখন থেকে নানা সন্দেহ তার মনে

কাঁটার মতো বিঁধছে। অপরাধটা যে কি হ'তে পারে তা আর সে ভেবে ঠিক করতে পারছে না। বিনোদিনী যদি তার সে অপরাধ মার্জনা করে তবেই সে আসবে। মার্জনা পাওয়ার পূর্বে সে আর বিনোদিনীকে মুখ দেখাবে না, এ নিশ্চিত।

ললিতা বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করলে হাসতে হাসতে, কি হয়েছে রে তারাপদর সঙ্গে ?

বিনোদিনী সোজা বললে, কিছুই হয়নি তো।

—তবে অভিমান কিসের ?

—অভিমান আবার কিসের !

ললিতা মুখ টিপে হেসে বললে, তবে যে মাফ চেয়ে পাঠিয়েছে। বলেছে, তোকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে।

এই ক'দিনের মধ্যে বিনোদিনীর কাঠিন্য যেন অনেকখানি ক'মে গেছে। যে সুকঠোর নীতির লৌহদুর্গে গৃহস্থ ঘরের কুলবধূ হয়ে এতকাল সে বিচরণ করছিল, এই ক'দিনে ধীরে ধীরে তা থেকে অনেকখানি দূরে স'রে এসেছে। যে কথা মনে আনাও সে অপরাধ বিবেচনা করত, ভয় করত তাতে গৃহের অকল্যাণ হয়, সেই কথা পরিহাস ক'রে সে অবলীলাক্রমে বললে।

বললে, আমাকে নয়, তোকে দেখবার জন্যে।

ললিতার কান পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল! চোখ নামিয়ে বললে, মরণ আর কি!

বিনোদিনী আর কিছু বললে না। সস্নেহে একটুখানি হাসলে।

ললিতা আবার বললে, তাই বুঝি তোর কাছে মাফ চেয়েছে ?

—তা কি ক'রে বলব ?

ওর কাছ থেকে ললিতা একটি কথাও বের করতে পারলে না। এমন শক্ত মেয়ে ও জীবনে দেখেনি। কিন্তু ও না বলুক, ব্যাপারটা ললিতাকে জানতেই হয়েছে। ঘর-সংসার থাকতে ও যে বাকি জীবনটা তাদের আখড়ায় কাটাবে এ কখনই হ'তে পারে না।

দুপুর বেলা স্কুল পালিয়ে তামাক খাবার জন্যে সুদাম আসতেই ও তাকে পরম সমাদরে আহ্বান করলে। সুদাম আর রাধিকার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সুদাম বৃহৎ একটি শিশু। আকারে প্রকারে এবং বয়সে যতখানি সে বেড়েছে, মনে ততখানি নয়। সেদিক দিয়ে সে এখনও ছেলেমানুষই আছে। সেইজন্যেই তাকে দেখে ললিতার লজ্জা হয় না মোটে। রাধিকা বয়সে ছোট আছে বটে, সেই অনুপাতে আকারেও। কিন্তু মনে তার এরই মধ্যে পাক ধরেছে। সুদাম ললিতার অত্যন্ত সন্নিকটে ব'সে তামাক খাবে আর গল্প করবে। কিন্তু রাধিকা কেবলই আড়ে আড়ে চাইবে। কোথায় বসনের ফাঁকে তার পরিপুষ্ট অঙ্গের আভাস জাগছে সেই দিকে তার দৃষ্টি। ললিতা তা বুঝতে পারে, তবু প্রশ্রয় দেয়।

বিনোদিনী গেছে বাসন মাজতে। ললিতা আঁচল পেতে শুয়েছিল। সুদামের গলার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

বললে, এস এস, সখা এস। তোমার কথাই ভাবছিলাম।

তামাক সাজতে সাজতে সুদাম বললে, কি, বল না কেন?

—তুমি লিখতে পার?

—তা আবার পারব না কেন? তবে আর ইস্কুলে পয়সা খরচ ক'রে পড়ছি কি করতে?

ললিতা হেসে বললে, পয়সা খরচ করছ বটে। কিন্তু পড়ছ ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

—ওঃ! রাধিকা কি আমার চেয়ে নম্বর বেশী পায় নাকি?

—কি জানি ভাই, ও তো বলে পাই।

সুদাম হঠাৎ মাথা তুলে চোখ বড় ক'রে বললে, ইতিহাসে ও কত পেয়েছে শুধিও না কেন।

নিরীহভাবে ললিতা বললে, তোমার চেয়ে তো বেশী পেয়েছে বললে।

—পেয়েছে!

—বললে তো।

একটা আঙুল তুলে উত্তেজিতভাবে সুদাম বললে, আমি পঁয়ত্রিশ পেয়েছি, তা জান ?

—ও বোধ হয় চল্লিশ পেয়েছে।

—পেয়েছে !

রাগে সুদাম জোরে জোরে টিকেয় ফুঁ দিতে লাগল।

হাসি চেপে ললিতা বললে, তা কত পেয়েছে ?

—একত্রিশ।

—তা যতই পাও ভাই, গরীবের পয়সাটি যেন লোকসান না হয়।

গম্ভীরভাবে সুদাম বললে, পয়সা আবার কিসের ?

—একখানি পোস্টকার্ট কিনে রেখেছি। একজনকে একটি জরুরী চিঠি লিখে দিতে হবে।

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে খুব মেজাজের সঙ্গে সুদাম বললে, ওঃ ! ভারি আমার কাজ, তার তিরিশ রকমের জেরা। কই দাও পোস্টকার্ট দেখি। দেরি ক'র না, আমার আবার ইস্কুল আছে।

—আবার ইস্কুল যাবে নাকি ?

—যেতে হবে না ? বাঃ রে ! আমি তো সংস্কৃতর ক্লাসে চ'লে এসেছি।

—ও।

ললিতা পোস্টকার্ড এনে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তারাপদর ঠিকানা লেখা সেই চিরকুটখানা।

বললে, এইটে ঠিকানা।

—তা জানি। কি লিখতে হবে, বল।

ললিতা বললে, বেশী কিছু নয় শুধু আমাদের ওর জবানী দিয়ে এখানে একবার আসতে লিখে দাও।

সুদাম খসখস ক'রে খানিকক্ষণ ধ'রে লিখে চিঠিখানা ললিতাকে প'ড়ে শোনালে। বললে, এই তো ? না আরও কিছু আছে ?

—আর, তোমরা সব কেমন আছ, এই সব।

অসহিষ্ণুভাবে সুদাম বললে, সে জানি। তাছাড়া আর কিছু নেই তো ?

—আবার কি ?

সুদাম খসখস ক'রে লিখতে লিখতে মাতব্বরের মতো জিজ্ঞাসা করলে, কে এই ছোকরা ?

—কলেজে পড়ে।

—তা জানি। তোমাদের কে হয় তাই জিগ্যেস করছি।

—আমাদের আপনার লোক হয়।

—তাই বল।

সুদাম লেখা শেষ ক'রে চিঠিখানা ললিতার দিকে ছুঁড়ে দিলে।

ললিতা বললে, আমি নিয়ে কি করব? তুমি ডাকবাক্সে ফেলে দিও।

—ও।

সুদাম চিঠিখানা বুক পকেটে রেখে আবার হুঁকোটা তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে তামাক খেতে লাগল। আর এক মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ওর তামাক খাওয়া দেখতে দেখতে ললিতা বললে, ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার আগে একবার বরং রাধিকাকে দেখিও।

ভ্রূকুটি হেনে সুদাম বললে, কেন ?

নিরীহভাবে ললিতা বললে, যদি কিছু ভুল থাকে।

রাগে এবং অপমানে সুদামের মুখ কালো হয়ে উঠল। কিন্তু সে আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে তামাক খেতে লাগল। তারপরে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে বোধ হয় পরের ক্লাসে যোগ দেবার জন্যে স্কুলে গেল।

তারাপদকে চিঠি লেখার বিষয় কিন্তু ললিতা রসময়ের কাছে গোপন করলে। এরকম করার কোনোই হেতু ছিল না, তবু বলতে পারলে না। কেমন সঙ্কোচ করতে লাগল। ভাবলে যদি তারাপদ আসেই,

তখন বললেই হবে। সুদামকেও সে একথা কাউকে বলতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিল। সুদামের বুদ্ধি মোটা, কৌতূহলও কম। ললিতা যে কোনো প্রতিশ্রুতি তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে পারে। ভয় কেবল তারাপদকে নিয়ে,—রসময়ের জন্মে নয়, বিনোদিনীর জন্যে। কিন্তু সে অনেক পরের ভাবনা। আগে সে আসুকই তো। তারপরে দেখা যাবে।

ললিতা আশ্চর্য হয়ে গেল, এরই মধ্যে সে মনে মনে তারাপদর জন্মে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিতও হ'ল। কিন্তু সেজন্মে মনের ব্যাকুলতা এক তিলও কম্‌ল না। তার প্রতি রসময়ের প্রগাঢ় ভালবাসা সে প্রত্যেক মুহূর্তে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে। সে ভালবাসা সুগভীর, কিন্তু শান্ত। তাতে তৃষ্ণার তরঙ্গ-বিক্ষোভ নেই। বোধ হয় সেই কারণেই অত্যন্ত স্বচ্ছ। অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। রসময়ের সান্নিধ্যে মাঝে মাঝে ওর মন একটি চমৎকার প্রশান্তিতে ভ'রে ওঠে। রসময়ের পায়ে আপনাকে সে বিকশিত ফুলের মতো অর্ঘ্য দেয়। পূজার আনন্দে ও তৃপ্তিতে সমস্ত মন সুরভিত হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ সে যেন সমস্ত ভার হারিয়ে ফেলে বায়ুর মতো হালকা হয়ে যায়।

কিন্তু সে মাঝে মাঝে। পূজার সুগম্ভীর মৌনতার মধ্যে মন তার থেকে থেকে হাঁফিয়ে ওঠে। খেলার সাথীর জন্মে ব্যাকুল হয়। সেই খেলার সাথী তার এরা, ওরা, তারা এবং তারাপদ। এদের প্রত্যেকের জন্মে তার মনের কোণে কোণে আগ্রহ আছে জ'মে। দেহ তার কাছে আনন্দোপলব্ধির উপকরণ মাত্র। তার বেশী নয়। রূপ এবং দেহের প্রতি তাই তার মমতা আছে কিন্তু নিষ্ঠা নেই। বস্ত্রের মতো এই দেহ অশুচি হ'তেও যতক্ষণ, শুচি হ'তেও ততক্ষণ। সুতরাং এর জন্মে সদাসর্বদা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবার কোনো কারণ নেই।

অপরাহ্নে নিমতলায় ব'সে রসময় আপন মনে সুর ক'রে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পড়ছিল। তার বিদ্যা বেশী নয়, এবং একখানি মাত্র গ্রন্থই

পুঁজি। তারও অতি সামান্য মাত্রই বোঝে, এবং হয়তো আর একটু বেশী উপলব্ধি করে। তবু পড়ার আগ্রহ কম নয়, এবং যখন পড়ে এই একখানি বই-ই পড়ে।

রসময় অনেকক্ষণ থেকেই পড়ছিল। ইতিমধ্যে ললিতা অনেক কিছু কাজে হাত দিলে। কিন্তু কি জানি কেন চঞ্চল মন কোনো কাজেই বসল না। অবশেষে হাতের কাজ ফেলে রেখে সে নিঃশব্দে এসে রসময়ের কাছে গিয়ে বসল।

রসময় পড়ছিল ঃ

কোমল নিম্বপত্রসহ ভাজা বার্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল—লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥

চোখ মোছবার জন্যে রসময় একবার থামল। ওর চোখে জল দেখে ললিতারও মন নরম হল। কিন্তু পাঠ শোনার চেয়ে গল্প করার ইচ্ছাই ললিতার বেশী। কারণ চৈতন্যচরিতামৃত হয়তো রসময় কিছুই বুঝছিল না। ললিতা আবার তাও বুঝছিল না। তাছাড়া, কিছু না বুঝলেও চৈতন্যচরিতামৃতের সুরের সঙ্গে রসময়ের চিত্তের কোথায় যেন যোগ আছে। তাই বইখানি ছোঁয়ামাত্র তার চোখ অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কিন্তু ললিতার সঙ্গে তার যোগ রসময়ের মারফত। তার চোখে যদি জল আসে সে চৈতন্যচরিতামৃতের কল্যাণে নয়, রসময়ের চোখে জল দেখে।

ললিতা চোখ মুছে বললে, তুমি যখন পাঠ কর, তখন তোমার কাছে বসলেই মনটা ভালো হয়।

রসময় মুখ তুলে হাসলে! বললে, হবে না? তবে আর এসব বইকে লোকে গ্রেন্থ বলে কেন?

গ্রন্থ বন্ধ ক'রে রসময় মাথায় ঠেকালে। ললিতাও দুই হাত জোড় ক'রে উদ্দেশে প্রণতি জানালে।

বললে, মোড়লকে একবার এখানে কোনো ছুতোয় আনলে হয় না?

—কোন মোড়ল?

—হারাণ মোড়ল গো।

রসময় চিন্তিতভাবে চুপ করে রইল।

ললিতা বললে, কি বলছ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু তামাক খাওয়াও না কেন?

ললিতা তামাক সেজে এনে আবার বসল।

রসময় বললে, কি যে ওদের গোলযোগ ঠিক বুঝতে পারছি না! তবে কঠিন কিছু বটে নিশ্চয়ই।

ললিতা সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ। নইলে স্বামী-পুত্র ঘর-সংসার আবার মেয়েতে ছাড়তে পারে?

উৎসাহিত হয়ে রসময় বললে, এই কথা! আবার তাও বলি শোন, বিনোদিদিরও রাগ বড় বেশী! মেয়েলোকের অত রাগ ভালো নয়।

ললিতা হেসে ফেললে। বললে, চিরকাল অমনি। ছেলেবেলায় আমার দাদার হাত কামড়ে রক্ত বের ক'রে দিয়েছিল।

—কেন?

ললিতা সংস্কারবশে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে গেল। গম্ভীরভাবে বললে, তা ঠিক মনে নেই।

চোখ নাচিয়ে রসময় বললে, ছেলেবেলায় তোমার দাদার সঙ্গে বিনোদিদির খুব ভাব ছিল, নয়?

উদাসীনভাবে ললিতা বললে, ছেলেবেলায় কত লোকের সঙ্গে কত লোকের ভাব হয়।

—তার পরে ভুলে যায়, না ললিতা ?

ললিতা হেসে বললে, সবাই কি ভোলে ?

রসময়ের মন মধুর রসে সরস হয়ে উঠল। বললে, তাও ভোলে না দেখছি। অন্ততঃ তুমি ভোলনি।

—ভুললেই ভালো করতাম, না ?

—কি জানি

পরক্ষণেই রসময় বললে, হয়তো ভুলতেও যদি বলরাম বাবাজি অতটা নিষ্ঠুর না হ'ত।

কোপ-কটাক্ষ হেনে ললিতা বললে, কি বললে ?

—মন্দ বলেছি ?

বেদী থেকে ধড়মড় ক'রে নেমে ললিতা বললে, ও! তুমি বুঝি ভেবেছ আর উপায় না দেখে তোমার গলগ্‌গেরো হয়েছি!

—তা তো বলিনি।

—তাই বলছ। নিমকহারাম কি না, তোমার জন্যে আমি মা-ভাই সব ছেড়েছি মনে নেই ? অমন লক্ষ্মণের মতো ভাই।

ললিতার চোখ জলে ভ'রে এল। গলার স্বর বন্ধ হ'ল।

বিব্রতভাবে রসময় বললে, আমি সে কথা তো বলিনি ললিতা। তুমি মিথ্যে রাগ করছ।

ললিতা কিন্তু তথাপি শান্ত হ'ল না। বললে, আমার ভালাবাসায় যদি সন্দেহ কর তোমার নরকেও ঠাঁই হবে না। জান ?

—কোনোদিন সন্দেহ করেছি ?

—আজ তো করছ।

রসময় জোরের সঙ্গে বললে, আজও করিনি। আমি শুধু বলছিলাম, বিনোদিদি নিশ্চয় তোমার দাদাকে ভুলেছে। তা না হ'লে কখনই সে···

বাধা দিয়ে ললিতা বললে, তুমি কি বল যা-তা! আমাকে আর বিনোদিদিতে! সে ছেলেপুলের মা, গেরস্তের বৌ।

হঠাৎ যেন রসময় আলো দেখতে পেলে। এই বড় কথাটাই তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সকল স্ত্রীলোক এক রকম নয়। তদুপরি নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব আছে।

রসময় মাথা নেড়ে বললে, তা বটে। কিন্তু তা ছাড়াও আরও কারণ আছে।

—কি ?

রসময় নিঃশব্দে শুধু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

অসহিষ্ণুভাবে বললে, তুমি বলরাম বাবাজিকে মালা-বদলই করেছিলে, ভালবাসনি।

রসময়ের মুখে বলরামের প্রসঙ্গ শুনলে ললিতা লজ্জিত হয়! সে হেসে বললে, সে কৈফিয়ত তোমাকে দিতে পারব না! তারপর বল।

—কিন্তু বিনোদিদি হারাণদাকে ভালবাসে।

ললিতা খিলখিল করে হেসে বললে, সে আমিও জানি! তুমি কি বলতে চাচ্ছ, তাই বল।

ললিতার হাসির চোটে রসময়ের খেই হারাবার উপক্রম হ'ল। তাড়াতাড়ি বললে, সেই কথাই তো বলছি গো। বিনোদিদির ত্রিসংসারে কোথাও যাবার উপায় নেই।

—এখানে তো এসেছে।

—হুঁ, এসেছে। কিন্তু কি জান···

ললিতা ঘাড় নেড়ে বললে, জানি।

মাটিতে একটা চাপড় দিয়ে রসময় বললে, কিছুই জান না। এখানে এসেছে তোমার ভরসায় নয়, আমার ভরসায়।

—কি রকম ?

জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে রসময় বললে, রকম এই যে, জানে আমি নিরীহ লোক। আবার আজ থেকে,—কিংবা আজ তেরস্পর্শ বাদ দিয়ে কাল থেকে যদি আমিও ওকে ভালবাসতে আরম্ভ করি, তাহ'লে পরশুই ও পালাবে।

ললিতা মুচকি হেসে বললে, সত্যি বলছ?

ওদের উচ্চ হাস্যের সাড়া পেয়ে বিনোদিনী ঢেঁকিশাল থেকে বেরিয়ে এল। রসময়কে কোমরে কাপড় জড়াতে দেখে সভয়ে বললে, ও আবার কি! মারামারি করবে নাকি?

ললিতা বিনোদিনীকে জড়িয়ে ধরলে। রসময়কে বললে, এই তো বিনোদিদি নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। ওকেই জিগ্যেস করতে পার।

বিনোদিনী বিস্মিতভাবে বললে, কি লো?

ওকে আসতে দেখেই রসময় ব'সে পড়েছে। নিরীহভাবে বললে, কিচ্ছু নয় বিনোদিদি, সামান্য কথা। জিগ্যেস করছিলাম, তোমার ঝাঁটাগাছটা কোথায় রাখলে, এইমাত্র।

—কেন, ঝাঁটার খোঁজ পড়ল কেন?

—খোঁজ নয়। ভালো ক'রে রেখ, তাই বলছিলাম।

খিলখিল ক'রে হেসে বিনোদিনী বললে, ঝাঁটা আবার ভালো ক'রে কি রাখব? সিন্দুকে রাখতে হবে নাকি?

—না, সিন্দুকে নয়। হাতের কাছে রেখ। নায়েববাবু হঠাৎ কুশল নিতে আসতে পারেন। বলা তো যায় না।

নায়েববাবুর কথা উঠতেই বিনোদিনী মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে আবার ঢেঁকিশালের দিকে ছুটে পালাল। ব'লে গেল, মরণ আর কি!

॥ পাঁচ ॥

পুজোর আর দেরি নেই।

ললিতা তিনটে বড় বড় বালতিতে রঙ গুলেছে। একটায় লাল, একটায় নীল, আর একটায় হলদে। এই সময়টায় এদিকে ফেরিওয়ালা আসে হরেক রকম রঙ, ফিতে, আলতা, চিরুনি এবং আরও বহু রকমের সৌখীন জিনিস বিক্রি করতে। ছেলেমেয়েদের সস্তা দরের নানা রকম ছিটের জামা, ফ্রক, পেনিও আছে। তার সঙ্গে শাড়ী ধুতিও। গঞ্জ এখান থেকে আট মাইলেরও বেশী দূর। সকলে তত দূর থেকে পুজোর কাপড়-চোপড় আনতে পারে না। দূরের জন্যেও বটে, আবার কোনো বাড়িতে লোকাভাব। বাধ্য হয়ে অনেককে সেজন্যে বেশী দাম দিয়েও এদের কাছ থেকে জিনিস কিনতে হয়। গেল বৎসর অনেক লোকের ভাগ্যেই পুজোয় নতুন কাপড় হয়নি। যারা কিনেছিল তারাও খুব কম কম ক'রে কিনেছিল। এবারে ফসলের অবস্থা দেখে চাষীদের মনেও যেমন আনন্দ হয়েছে, ফেরিওয়ালাদের মনেও তেমনি। তারা যেন দলে দলে গ্রামে আসতে লাগল।

ফসলের সঙ্গে ললিতা-রসময়ের কোনোই সম্পর্ক নেই। রানী অন্নপূর্ণা পুজোর সময় বৎসর বৎসর কিছু বস্ত্র দান করেন। রানী যদিচ সিংহ গোষ্ঠীর, এবং তাঁর জমিদারি কাঞ্চনপুর নয়, সাত গাঁ,—তবু তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে এই একটি বৈষ্ণব পরিবার কখনও বঞ্চিত হয়নি। রানী খেতাব তাঁর গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে পাওয়া নয়। কিছুটা বড় জমিদারের গৃহিণী ব'লে এবং কিছুটা তাঁর দান-ধ্যানের জন্যে সাধারণ্যে

তিনি রানী বলেই পরিচিতা। তাঁর বদান্যতায় রসময়-ললিতার কখনও পুজোর সময় নতুন বস্ত্রের অভাব ঘটেনি। এবারে আশঙ্কার কারণ ঘটল প্রথম,—নায়েববাবুর রোষ-দৃষ্টিতে প'ড়ে। কারণ রানী যত দানশীলাই হোন, আখেরে তাঁকে শুনতে হবে ওই নায়েববাবুর কান দিয়ে, দেখতে হবে ওঁরই চোখ দিয়ে এবং দিতেও হবে ওঁরই হাত দিয়ে। সুতরাং আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু মুখে সে আশঙ্কা কেউই প্রকাশ করলে না।

এমন সময় বিনোদিনী একদিন কোথা থেকে এক জোড়া ফেরিওয়ালা এনে উপস্থিত করলে—একটা রঙওয়ালা, একটা কাপড়-ওয়ালা। এবং সেই সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ললিতাকেও টেনে আনলে হাতে ধ'রে। বললে, কি কিনবি কেন্।

ললিতার মুখ শুকিয়ে গেল। তারা গৃহী নয়, সঞ্চয় তাদের ধর্ম-বিরুদ্ধ। নিতান্ত একটা সংসার আছে ব'লেই চাল ডাল এবং এই রকম আহার্য সঞ্চিত থাকে, তাও বড় জোর দু'এক দিনের জন্যে। সে কাপড় কিনবে কি ?

ভয়ে ভয়ে বললে, আমি তো কাপড় কিনব না ভাই।

—কিনবি না কি রকম ? শিউলির বোঁটা কুড়িয়ে জড়ো করেছিস এক রাশ, আর কাপড় কিনবি না ?

—না।—দৃঢ়স্বরে ফেরিওয়ালাদের ললিতা বললে, তোমরা যাও বাছা, আমরা কিছু কিনব না।

ওরা হতাশভাবে বিনোদিনীর দিকে চেয়ে মোট তুলতে যাচ্ছিল, বিনোদিনী বললে, দাঁড়াও।

কাপড়-চোপড় পাঁচখানা দেখে বিনোদিনী পছন্দ করলে চওড়া লাল পাড় একখানা শাড়ী আর একখানা থান ধুতি।

ললিতা বললে, থান আবার কি করবি ?

বিনোদিনী হেসে বললে, আহা রে! নিজেরটি হ'ল, আর

রসময়ের কিছু চাই না বুঝি ? এতে বহির্বাস হবে না ? দেখ দেখি এই পাড়টা তোর পছন্দ বটে তো ? না, অন্য পাড় নিবি ?

খুশীতে ললিতা ছেলেমানুষের মতো চঞ্চল হয়ে উঠল। খপ ক'রে ওর হাত থেকে শাড়ীখানা নিয়ে নিজের গায়ে মেলাতে মেলাতে বললে, বাঃ, চমৎকার কাপড়টি তো ! আমার খুব পছন্দ হয়েছে। একজোড়া বুঝি ?

ফেরিওয়ালা বললে, হ্যাঁ মা, এক জোড়া।

—জোড়া নাকি ? —বিনোদিনী বললে, তাহ'লে একখানা কেটে নাও বাছা।

ললিতা বিস্মিতভাবে বললে, কেটে আবার নেবে কেন, তোর একখানা, আমার একখানা।

—আমার দরকার নেই।

কাপড়খানা ফেরিওয়ালার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ললিতা বললে, তা'হলে আমারও দরকার নেই।

অবশেষে তিন টাকা দিয়ে বিনোদিনীকে একজোড়াই কিনতে হ'ল। সেই সঙ্গে খানিকটা নীল আর লাল রঙ এবং গিরিমাটি। ছিটের একটা ফ্রক আর কোট দেখে ওর মনটা হঠাৎ হু হু ক'রে উঠল। অশ্রু গোপন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল টাকা আনবার অছিলায়। ইচ্ছে হ'ল মেঝেয় ব'সে খুব খানিকটা কাঁদে। কিন্তু তার হয়েছে চোরের মায়ের মতো,—জোরে কাঁদবারও উপায় নেই।

ললিতা হেসে বললে, ধন্যি মেয়ে তুই বিনোদিনী ! এর মধ্যে অত টাকা জমিয়েছিস !

—অত আবার কোথায় ! এই তো ফুরিয়ে গেল।

—গেছে। দাঁড়াও, তোমার পুঁজি আমি ফাঁক করছি।

—বেশ তো।

বিনোদিনী এখন একটু নিরিবিলি চায়। সে আর দাঁড়াল না।

তারপরে ললিতা আজ লেগেছে রঙ নিয়ে। তিনটি বালতিতে রঙ গুলেছে এবং বিনোদিনীর কাপড়ও জোর ক'রে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাও রাঙিয়েছে। ওর সঙ্গে পারা অসম্ভব।

বললে, দেখ দেখি কেমন রাঙিয়েছি!

একটার মধ্যে সবুজ আর দুই ধার পাড় ছাড়িয়ে আরও চার আঙুল চওড়া লাল। আর একটার মধ্যে হলদে, দুই ধার লাল। এর মধ্যে কৌশল আছে।

বিনোদিনী প্রশংসা ক'রে বললে, বেশ হয়েছে!

—কোনটা নিবি বল?

দুষ্টুমি ক'রে বিনোদিনী বললে, কোনোটাই না।

ললিতা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, আমাকে রাগাস না বিনোদিনী। দোব দু'খানা কাপড় নদীর গর্ভে।

—দে না কেন?

—দোব! এই কাপড় পরিয়ে তোকে নিয়ে পুজো দেখতে বেরুব, তবে আমার নাম ললিতা।

বিনোদিনী গম্ভীরভাবে বললে, আমি পুজো দেখতে বেরুবই না।

—না। তুই কি বেরুবি, তোর ঘাড় বেরুবে।

বিরক্তির সঙ্গে বিনোদিনী বললে, আচ্ছা, সত্যি ললিতা, ওই কাপড় প'রে বেরুবার আমার আর বয়স আছে?

—কি জানি। নায়েববাবুকে জিগ্যেস করলেই পারিস।

বিনোদিনী রাগতে গিয়ে হেসে ফেললে। বৃদ্ধ নায়েব কালীশঙ্করের কথা মনে হ'লেই এখন তার হাসি পায়। ঘাটের মড়া, তবু লোভটুকু এখনও ঠিক আছে।

বললে, তুই মর্, তোর নায়েববাবুও মরুক।

বেড়ার গায়ে কাপড় দু'খানা মেলতে মেলতে ললিতা বললে, আমার নায়েববাবু কি রকম? ঘাটের মড়া ব'লে বুঝি আমার ঘাড়ে চাপান? মন্দ নয়।

প্রত্যুত্তরে বিনোদিনী কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় অপরিচিত জুতার মশমশ শব্দে সচকিত হয়ে দু'জনেই পিছন ফিরে দেখলে, তারাপদ একটা ছোট স্যুটকেস হাতে একেবারে উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতের স্যুটকেসটা নামিয়ে তারাপদ বিনোদিনীকে দেখে বললে, এই যে!

ললিতাকে সে দেখতে পায়নি। বিনোদিনীর বিস্মিত স্তব্ধ মূর্তি দেখে তার আর বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। শুধু হি হি ক'রে একটু শুষ্ক হাসি হাসলে।

বেড়ার গায়ে কাপড় নামিয়ে রেখে ললিতা এগিয়ে এল। ধীরকণ্ঠে বললে, এস।

স্যুটকেসটা ললিতা নিজের হাতে দাওয়ায় তুলে রাখলে। একখানা মাদুর পেতে তারাপদকে বসতে দিলে। পা ধোবার জল দিলে। বিনোদিনী আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। ললিতা বিনোদিনীকেও কিছু বলতে পারলে না, তারাপদকেও না।

এক মুহূর্তে হাওয়া যেন বদলে গেল।

একটু পরেই রসময় এল গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। আজ আজ সে ভিক্ষেয় বের হয়নি। এই দিকেই কোথাও গিয়েছিল। আপন মনেই কি একটা কথা ভাবতে ভাবতে সে আসছিল। হঠাৎ তারাপদকে দেখে প্রথমটা থমকে গেল। পর মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত আনন্দে ব'লে উঠল : .

—এই যে বাবু মশায়! কতক্ষণ এলেন?

তারাপদ দাওয়ায় একটা মাদুরে নিঃশব্দে চিন্তিত মুখে ব'সে ছিল। শুষ্ক হাস্যে বললে, এইমাত্র। গিয়েছিলেন কোথায়?

—আমার কথা আর বলবেন না। গিয়েছিলাম একবার···আপনি যে গরীবের আখড়ায় পায়ের ধুলো দিয়েছেন···বিলক্ষণ! বহু ভাগ্যি। কিন্তু এরা সব গেল কোথায়?

রসময় অতিথি সম্বর্ধনার জন্যে ব্যস্ত এবং বিব্রত হয়ে উঠল। তার আখড়ায় ভদ্র বাবুবেশী অতিথি এই বোধ হয় প্রথম।

—ওগো!

ললিতা নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ব'সে ছিল। ভুরু পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এল।

ওর মাথায় রসময় কখনও এত বড় ঘোমটা দেখেনি। বড় জোর আধ ঘোমটা। অবগুণ্ঠিতা ললিতার জবুথবু ভাব দেখে রসময় হাসি চাপতে পারলে না।

বললে, বিলক্ষণ! তিনি কোথায়? বিনোদিদি? তিনিও ঘোমটা দিয়ে ঢেঁকিশালে ব'সে আছেন নাকি?

লজ্জা পেয়ে ললিতা ছুটে ঘরে পালাল। ওদিকে খিড়কির পথ থেকে বিনোদিনী হাত-ইসারায় রসময়কে ডাকলে।

—এই যে!—রসময় ওর কাছে গিয়ে বললে, এখানে কি করছ?

—কিছু করিনি। শোন,—বিনোদিনী আঁচলের খুঁট থেকে তু'টি পয়সা বের করে বললে, তু'পয়সার মিষ্টি নিয়ে এস। কুটুম এসেছে, শুধু মুড়ি তো আর দেওয়া যায় না।

—নিশ্চয়। তাই তো খুঁজছিলাম তোমাকে।

রসময় তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে এল। এসে দেখে তারাপদর মুখে সে বিষণ্ণ চিন্তিত ভাব আর নেই। কি যাতুমন্ত্রে যে এই এক মিনিটের মধ্যে এমন পরিবর্তন সম্ভব হ'ল তা সে জানতেও পারলে না।

ভদ্রলোকের সামনে শুধু পায়ে হাঁটতে বোধ হয় রসময়ের লজ্জা হ'ল। তাড়াতাড়ি ফিতে-বাঁধা খড়মজোড়া বের ক'রে পায়ে দিলে। খটখট ক'রে বেরিয়ে যাবার সময় ব'লে গেল, আমি এলাম বলে। বাবু মশায়।

সম্বোধন শুনে ঘরের ভিতর ললিতা ফিক ক'রে হেসে ফেললে। সঙ্গে তারাপদও।

দ্বারপ্রান্ত থেকে মুখ বাড়িয়ে ললিতা বললে, চিঠি পাওয়ার কথা কাউকে ব'ল না যেন।

—কেন?

—বলব পরে! ব'ল না, বেশ।

ওর চোখের সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে তারাপদর মন ভিজে গেল। বললে, তাই হবে।

ললিতা একটু হেসে, বোধ হয় বিনোদিনীর পায়ের শব্দ পেয়ে, মুখ সরিয়ে নিলে।

বিনোদিনীই বটে। ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের ভাব কাটতেই তারাপদর এক মিনিট লাগল। রুখু চুলে তেল পড়েনি কতকাল। পাণ্ডুর মুখে অসীম বৈরাগ্য! শীর্ণ দেহ যেন দুর্বহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। ক'মাস সে দেখেনি বিনোদিনীকে? দু' মাস? তিন মাস? কিন্তু মনে হ'ল যেন এক যুগ। দু' মাসে মানুষের এমন আকাশ-পাতাল পরিবর্তন হয় না।

তারাপদ উঠে গিয়ে হেঁট হয়ে ওর পায়ের ধুলো নিলে।

—ভালো আছ?

বিনোদিনীর কণ্ঠ আশ্চর্যরকম শান্ত। তাতে উচ্ছ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই।

বিনোদিনী তারাপদর পিছু পিছু দাওয়ায় এসে বসল।

জিজ্ঞাসা করলে, কখন বেরিয়েছিলে?

—আর ব'ল না বড়বৌ। রাত্রে স্টেশনে নেমেছি, আর এতক্ষণে পোঁছলাম। হেঁটেই চলেছি, রাস্তা আর ফুরোয়ই না। হ্যাঁ, বেছে বেছে জায়গাটি বের করেছ ভালো!

এতক্ষণে ললিতার মুখে কথা ফুটল। ঘরের ভিতর থেকে টিপ্পনি কাটলে, কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে?

তারাপদ হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, কেষ্টপ্রাপ্তিরই যোগাড় হয়েছিল ললিতা ঠাকরুন। কেবল চাঁদিনী রাত ব'লে বেঁচে গেছি। তা তুমি ঘরের ভেতর থেকে কি বেরুবে না?

বিনোদিনী ডাকলে, আয় ললিতা।

ললিতা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বিনোদিনীর পিঠের আড়ালে বসল।

বিনোদিনী বললে, রাত্রে বেরুনো তোমার ভালো হয়নি।

—রাত্রে কি আর বেরুতাম? কেবল দু'জন সঙ্গী পেলাম তাই। তোমাদের এই দিকে ফুলবেড়ে না কি গ্রাম আছে সেইখানকার দু'জন লোক। বললে, কেন রাত্রে মিছিমিছি স্টেশনে কষ্ট পাবেন? দিনেও রোদে কম কষ্ট হবে না। আমাদের সঙ্গে চলুন,—ফুলবেড়ে থেকে সোজা বাদশাহী সড়ক গেছে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন।

—তুমি তাহ'লে শহর থেকে আসছ?

—হুঁ।—কি ভেবে আবার বললে, তবে বাড়ির খবর রাখি। সবাই ভালো আছে।

বিনোদিনী চুপ ক'রে নত মুখে ব'সে রইল।

—আর এবারে যা ধান হয়েছে। ওঃ!

তারাপদ এটুকু বুঝল যে, বাড়ির প্রসঙ্গ এখনই না তোলাই ভালো। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলে।

বিনোদিনী তথাপি চুপ ক'রে রইল। তার মাথায় এবং মনে যে কত চিন্তা আঁকুবাঁকু করছিল তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, তা তোমার বড়বৌএর জন্যে শহর থেকে কি আনলে?

—নিজেই এলাম, আর আনব কি? ললিতা ঠাকরুন, তোমার সেই মিষ্টি গলার গান কিন্তু রাত্রে শোনাতে হবে।

ললিতা লজ্জায় মুখ লুকোলে।

এমন সময় খড়মের শব্দ করতে করতে ব্যস্তভাবে রসময় ফিরল।

—আমাদের এই পোড়া দেশের কথা আর বলবেন না বাবু মশায়! ভদ্রলোক এলে মান-সম্মান রাখাই কঠিন। ছানার জিনিস বলতে কিছু রাখে না। এই মণ্ডা, বললে তো আদ্ধেক ছানা, আদ্ধেক চিনি,—এখন ওর ধর্ম ওর ঠাঁই।

ললিতা ফিসফিস ক'রে বললে, বাবু মশায়দের দেশে যে এও পাওয়া যায় না।

—শহরে তো পাওয়া যায় গো।

—তা যায়।

—তবে? ওঁকে এখন সেইখানকারই ধরতে হবে। বটে কি না, বলুন।

ব'লে হো হো ক'রে রসময় হেসে উঠল।

বিনোদিনা ঠোঙাটা ওর হাত থেকে নিয়ে ঘরে গেল। এ সংসারে থালা বাসনের আয়োজন কম। একটা শালপাতায় ক'রে তারাপদকে জল খেতে দিলে মুড়ি আর মণ্ডা।

—কাঁচা লঙ্কা নেই? —রসময় জিজ্ঞাসা করলে।

মেয়েরা অনাবশ্যক বিবেচনায় সে কথার আর সাড়া দিলে না।

রসময় আবার বললে, আহা, ওঁদের ওখানে খাচ্ছিসুখ কত গো। দেখেছ তো! আর আমারও কি যেন হয়েছে। এসে পর্যন্ত এক কলকে তামাকও বাবু মশায়কে দেওয়া হয়নি।

তারাপদ তাড়াতাড়ি বললে, থাক, থাক। আমার কাছে সিগারেট আছে।

রসময় হেসে বললে, হুঁ! বাবু মশায়, সিকরেটে যদি তামাকের কাজ হ'ত, লোকে আর তাহ'লে কষ্ট ক'রে তামাক খেত না। বলে, দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে!

ওর কথার ভঙ্গিতে মেয়েরা হেসে উঠল।

বিনোদিনী ওকে আড়ালে ডেকে বললে, ভালো মাছ যদি পাওয়া যায়, দেখ দেখি।

—তাই তো বলছিলাম। ভালো মাছ না হ'লে কি···

ধমক দিয়ে বিনোদিনী বললে, আস্তে।

গলা নামিয়ে রসময় বললে, আস্তেই তো বলছি। মাছ পাওয়াই সঙ্কট। আজ তো আর হাট নয়।

—দেখই না।

—দেখছি। তামাকটা খেয়ে যাই।

বাইরে এসে তামাক সাজতে সাজতে রসময় বললে, সিকরেটের কথা বলছিলেন? ও আপনাদের বাবু-ভায়াদেরই পোষায়, আমাদের নয়।

একটু হেসে ললিতাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, গেল বচ্ছর তেরই বোশেখ সেই যে গঞ্জে গেলাম, গিয়ে কিনেছিলাম একটা সিকরেট। রাম বল! ওই আবার মানুষে খায়! একটা শোঁ-টান দিতেই নেই। বাতাসের মতো। গলায় গিয়ে সাড়াই দেয় না!

তারাপদর জলযোগ ইতিমধ্যে হয়ে গেল।

হুঁকোয় দু'টো টান দিয়ে রসময় হঠাৎ বললে, এই যাঃ! আপনার হুঁকো তো আনা হয়নি। আচ্ছা, সে হবে। পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি একটা চেয়ে। আপাতত···ছুরিখানা কই গো?

ছুরি নিয়ে বাড়ির পাশের কলাগাছ থেকে একটা পেটো কেটে নিয়ে এল। তাই দিয়ে একটা হুঁকো তৈরি ক'রে বললে, নিন, একটু তামাক ইচ্ছে করুন।

যাবার সময় ব'লে গেল, আমি এলাম ব'লে। যাব আর আসব। তারপরে একসঙ্গে চান করতে যাব। আপনি ততক্ষণ বিশ্রাম করুন। বিনোদিদি, তোমার কাজ রাখ, রেখে রান্না চড়াও।

বিনোদিনী হেসে বললে, আচ্ছা। তোমাকে তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না। তুমি যে কাজে যাচ্ছ তাই যাও।

—না, তাই বলছিলাম। তোমার আবার আঠারো মাসে বছর কি না!

রসময় খড়ম প'রে ভব্যযুক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল! তারাপদ সেই মাতুরে গা গড়ালে। আর ললিতা বিনোদিনীর পিছুপিছু রান্নাঘরে গেল।

বললে, কি রান্না হবে আজকে?

বিনোদিনী চিন্তিতমুখে বললে, তাই তো ভাবছি। মুগের ডাল আর পোস্তর বড়া, আর একটা শাক। আর মাছ যদি পাওয়া যায়··· কি বলিস?

—সে বেশ হবে। মাছের টক করিস।

—পাওয়াই তো যাক।

একটু থেমে ললিতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বলে তোর পুকুরে কত মাছ! আর আজকে একটা মাছের জন্যে···

বিনোদিনী যেন সে কথা শুনতেই পেলে না, এমনিভাবে উনান ধরাতে বসল। জিজ্ঞাসা করলে, তোর উনান ধরাবি না?

—এই যে ধরাই। দু'টো কচু বোধ হয় আমার ডালায় প'ড়ে আছে। দেখি, দাঁড়া।

শুধু দু'টো কচু নয়, আধখানি বেগুনও ডালায় প'ড়ে ছিল। সেগুলো বিনোদিনীকে দিয়ে দিলে।

—সব দিয়ে দিলি, তোরা কি রাঁধবি?

নিশ্চিন্তভাবে ললিতা বললে, কেন, শাক রয়েছে অত!

তা বটে। ভাতের সঙ্গে ঝোল শাক থাকলে আবার কি চাই? তাই কি এদের প্রত্যহ জোটে? আবার এরা তো তবু রোজ এক বেলা রাঁধে; বিনোদিনী এক বেলা রাঁধে, পাঁচ বেলা খায়। নিজের পেটে দু'টো খাওয়ায় আবার ঝঞ্চাট কি? কুটুম্বলোক এসেছে ব'লেই না এত!

বিনোদিনী বললে, তু'টো বড়ি আমার হাঁড়িতে আছে। দোকান থেকে এক পয়সার তেঁতুল আনালেই হবে।

ললিতা বিস্মিতভাবে বললে, বড়ি আবার কোথায় পেলি ?

—সেদিন ক'টা দিয়েছিলি, তার তু'টো রেখে দিয়েছিলাম।

বিনোদিনী হাসলে।

গালে হাত দিয়ে ললিতা বললে, বাবা, গিন্নিপনা শিখেছিলি বটে! বলে, 'অতি বড় ঘরণী···

ললিতা কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

।। ছয় ।।

গত রাত্রির সমস্তটাই তারাপদর জেগে কেটেছে। ট্রেনের ভ্রমণটা অল্পকাল স্থায়ী। তার মধ্যে যদিচ পা ছড়িয়ে শোবার জায়গা মিলেছে, ঘুমোবার সময় মেলেনি। আর ট্রেন থেকে সমস্ত পথটা হেঁটেই কেটেছে। রেল-ভ্রমণের মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। কিন্তু সারারাত্রি পদব্রজে চলার স্মৃতি তার মনে চিরকাল জেগে থাকবে। এত কষ্ট, এবং সেই সঙ্গে এত আনন্দ, সে আর কখনও উপভোগ করেনি।

তিথিটা জানা নেই, কিন্তু আশ্বিনের শুক্লপক্ষ। মাঠময়, যতদূর দৃষ্টি চলে, চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দুই পাশে ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে আখের জমি ভয়ঙ্কর ঝোপের সৃষ্টি করেছে। নিস্তব্ধ, জনহীন রাত্রে সেদিকে চাইতেও ভয় করে। মাঝে মাঝে মাঠের পুকুরের জল চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। থেকে থেকে হাওয়া লেগে ধানের এবং আখের ক্ষেতে শনশন শব্দ হচ্ছে। মাঝ দিয়ে চলেছে প্রশস্ত বাদশাহী সড়ক। সড়কের দুই পাশে ছায়াপ্রদ বড় বড় গাছ কোথাও কোথাও পথ একেবারে অন্ধকার ক'রে রেখেছে। চলতে ভয় করে। সুবিধা এই যে, রাত্রেও এ পথ একেবারে জনহীন নয়। চলতে চলতে কখনও দু'চারজন রাহী লোকের সঙ্গে, কখনও বা দু' একখানি গরুর গাড়ীর সঙ্গে দেখা হচ্ছেই।

তবু কেমন রহস্যময় মনে হয়। মাথায় জননীর স্নেহের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে। গাছের পাতা থেকে অবিরত শিশির পড়ার শব্দ

হচ্ছে টপটপ। ধানের পাতাগুলো শিশিরে ভিজে চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশে এক ফালি চাঁদ বিধাতার হাসির মতো জ্বলজ্বল করছে। দূরে দূরে গাছে-ঢাকা গ্রামগুলো যেন লেপ-মুড়ি দিয়ে আঘোরে ঘুমুচ্ছে। এমন রাত্রে পথ চলতে গেলে মানুষের বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগ ছিঁড়ে যায়। বিশ্বাস হয় না যে, সে জাগ্রত জীবন্ত, এই পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এ যে ধূলিভরা মাটির রাজপথ তা মনেই হয় না। মনে হয় যেন আকাশের ছায়াপথ,—কিংবা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রূপকথার যে পথ গেছে অচিনপুরীর রাজকন্যার দেশে সেই পথ। এর যেন শেষ নেই, অনন্তকাল হাঁটলেও ফুরোবে না।

সঙ্গীরা বললে এ সড়ক অজ্ঞাতকালে কোনো বিস্মৃত বাদশাহের তৈরী। এর শেষ নেই। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে চ'লে চ'লে শিরার মতো ভারতের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে। কে ঠিক করবে কোথায় এর গোড়া আর কোথায়ই বা শেষ! এই পথে এসেছে মোগল জয়ডঙ্কা পিটিয়ে। সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে রামগড়ের জঙ্গল পার হয়ে পঙ্গপালের মতো এসেছে বর্গী। ব্যাণ্ড বাজিয়ে মার্চ ক'রে গেছে কোম্পানীর তেলিঙ্গী ফৌজ। গেছে কত নিরীহ তীর্থযাত্রী নরনারী, কত সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির, আউল-বাউল-দরবেশ, কত ঠগী-ঠেঙারে-খুনী। সেই কাল থেকে এখন পর্যন্ত কত গেছে বিয়ের মিছিল, আর কত গেছে শবযাত্রা, কে তার হিসাব রেখেছে! এর ধূলায় ধূলায় কত যুগের কত মানুষের হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, ভয়-ভাবনা মিশে আছে কেউ কি বলতে পারে? নিশুতি রাত্রে অকস্মাৎ যদি এই পথ কথা কয়ে উঠত, —গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো—এই পথে চলতে চলতে যারা যে কথা ব'লেছিল রাজপুত্র নববধূর কানে কানে, চুপে চুপে, সেই অতি তুচ্ছ কথা! সুদূর অতীতকালে ক'টি গৃহস্থ রমণী নিজেদের মধ্যে যে ঘরোয়া কথা বলতে বলতে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিল সেই কথা! তাহ'লেও কিন্তু তারাপদ বিস্মিত হ'ত না।

তার মনে হ'ল পথ যেন কথা কইছে। অত্যন্ত চুপে চুপে হাওয়ায় হাওয়ায়। তার কিছু যেন বোঝা যাচ্ছে। দূরে বড় একটা গাছের নীচে যেন একখানা তাঞ্জাম নামান। তার উপর, পাতার ফাঁক দিয়ে, গুচ্ছ গুচ্ছ চন্দ্রালোক একসঙ্গে এসে পড়েছে। তারাপদর মনে হ'ল অকস্মাৎ অকারণেই মনে হ'ল, ওর মধ্যে তনুদেহ এলিয়ে শুয়ে আছে মেহেরউন্নিসা। নিরাভরণা, স্বামীবিরহকাতরা, অশ্রুমুখী। চলেছে দিল্লী,—জাহাঙ্গীর বাদশাহের হারেমে। বাঁদীর হীরার অলঙ্কার চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে। পৃথিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের একজনের সঙ্গে তার একরকম দেখাই হয়ে গেল।

মোগল যুগ নয়, পাঠান যুগ নয়, বৌদ্ধ যুগ নয়,—যে যুগ চিরযুগ, যে কাল চিরকাল, সেই কালের মধ্য দিয়ে তারাপদর গত রাত্রি কেটে গেছে। যে কালের মধ্যে সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল মিশে এক হয়ে গেছে, এ সেই কাল। বহু ভাগ্যে চন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ রাত্রে তারই সঙ্গে তারাপদর অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়ে গেল। তারপরে কি ক'রে রাত্রি কেটে গিয়ে প্রভাত হ'ল, প্রশস্ত বাদশাহী সড়কের একটি ক্ষীণ ধারা রসময়ের আখড়ার বহির্দ্বারে এসে ফুরিয়ে গেল, এ আর সে বুঝতেই পারলে না। গত রাত্রের কথা স্বপ্নের মতো বোধ হয়।

আহারাদির পর পথশ্রমে, নিদ্রায় তারাপদর শরীর যেন ভেঙে পড়ল। মাদুরে গা গড়াবামাত্র রাজ্যের ঘুম নেমে এল চোখে। রসময় হুঁকো কলকে নিয়ে এসে খোশগল্প আরম্ভ করেছিল, কিন্তু একটু পরে ওর নাসিকা-ধ্বনিতে বুঝলে তার অনেক গল্প মাঠে মারা গেছে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে রসময় আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। ললিতা এবং বিনোদিনীকে ওর ঘুম ভাঙাতে নিষেধ ক'রে দিলে। তারপরে

বিনোদিনীর দেওয়া নতুন বহির্বাসটি ঘরে ব'সে সেলাই করতে আরম্ভ করলে। সূচের কাজে দরজি ওর কাছে হার মানে।

সেই নিদ্রা ভাঙল, যখন বেলা আর নেই।

রসময় তারাপদর রাত্রের আহারাদির ব্যবস্থার জন্যে দোকানে গেছে।

বিনোদিনী গেছে ঘাটে গা ধুতে। ললিতা গা ধুয়ে এসে সবে কাপড় ছাড়ছে, এমন সময় হাই তোলার শব্দে উঁকি দিয়ে দেখলে তারাপদ চোখ মেলেছে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করার মতো শক্তি হয়নি।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, কুম্ভকর্ণ তোমার কে ছিল তারাপদ?

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে তারাপদ উত্তর করলে, ভায়রা ভাই।

চোখ ঘসতে ঘসতে আবার জিজ্ঞাসা করলে, এটা আজ না কাল ললিতা ঠাকরুন?

—কাল। আজ কোন কালে শেষ হয়ে গেছে।

—আমারও তাই বোধ হচ্ছে। বড়বৌ কোথায়?

—ঘাটে।

—বাবাজি?

—কি জানি। এখনি তো ছিল।

তারাপদ চোখ-মুখ ধুয়ে সুটকেস থেকে আয়না-চিরুনি বের ক'রে প্রসাধন সেরে নিলে।

ললিতা চৌকাঠের বাইরে ব'সে বললে, ভালো কথা। কি ব্যাপার বল তো?

—কিসের?

—বিনোদিনীর?

তারাপদ বিস্মিতভাবে বললে, তোমরা জান না?

—কিছু না।

—কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করনি?

—না, সাহস করিনি। অথচ কেবলি মনে হয়েছে···

—হুঁ। —একটু চুপ ক'রে থেকে তারাপদ বললে, সে একটা বিশ্রী ব্যাপার ললিতা। এর জন্যে আমিই দায়ী।

ললিতা নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগল।

—আমাদের সেদিনের কাণ্ড বড়বৌ জানতে পেরেছে।

তারাপদ হেসে ফেললে। ললিতাও লজ্জায় মুখ নামালে।

—তাই নিয়ে আমি বড়বৌএর পায়ে ধরতে গিয়েছিলাম। এমন সময় পালেদের বৌ এসে উপস্থিত। আমাদের সেই অবস্থায় দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে পালাল এবং তারপরে লোকের মুখে মুখে ঘটনাটা যা দাঁড়াল বুঝতেই পারছ।

একটু থেমে ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, কথাটা মোড়লের কানেও উঠল বুঝি?

—হ্যাঁ। হারাণদা তাই নিয়ে নিশ্চয় কিছু কড়া কথা বলেছিল। পরের দিন থেকে বড়বৌ নিরুদ্দেশ।

—মোড়ল ভেবেছে বিনোদিনী মারা গেছে।

তারাপদ হেসে বললে, হ্যাঁ। অমন একজেদী মানুষ তো পাবে না। তার মনের সেই যে বিশ্বাস বড়বৌ গৃহত্যাগ করতে পারে না, কার সাধ্য সে বিশ্বাস টলায়? বড়বৌএর যথারীতি শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেল।

ললিতাও হাসলে। বললে, এখন কি করবে?

সে সম্বন্ধে তারাপদও কিছু ঠিক করেনি। বললে, কি করি বল তো? আবার পা চেপে ধরব?

ললিতা ফিক ক'রে হেসে বললে, তোমার পা চেপে ধরার সাৎ ভালো নয়।

গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হেনে তারাপদ বললে, একজনের বেলায় তো ভালোই হয়েছিল।

চোখ নামিয়ে ললিতা বললে, সবাই তো ললিতা নয় যে, পা ধরলেই গ'লে যাবে।

—সে আমারই অদৃষ্ট দোষে। এখন কি করব, বল।

একটু চুপ ক'রে থেকে ললিতা বললে, চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। কিন্তু আমার মনে হয় বিনোদিনী তোমার ওপর খুশী নয়।

—কেন?

—তা জানি না।

তারাপদ দস্তুরমতো দ'মে গেল। তাহ'লে?

ললিতা ভরসা দিয়ে বললে, তবু একবার দেখতে পার। একটু নিরিবিলি চেষ্টা কর।

ব'লে একটা কটাক্ষ হেনে হাসলে।

তারাপদ বললে, যাঃ!

উঠান থেকে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুরপো উঠেছে?

—এই উঠলেন।

বিনোদিনী বললে, তোমার চায়ের জল চড়িয়ে দিই ঠাকুরপো। একটু দেরি হয়ে গেল বোধ হয়।

তারাপদ বললে, না, না। এই রকম সময়েই খাই।

ললিতা গালে হাত দিয়ে বললে, ও হরি! আবার চায়ের নেশাও ধরিয়েছ!

তারাপদ হেসে বললে, বাকি কিছুই রাখিনি।

বিনোদিনী উনান ধরাতে গেল।

ললিতা চুপিচুপি বললে, এই সময়। আমি একটু ঘুরে আসি।

—বিনোদিদি গো!

খড়ম পায়ে দিয়ে রসময় এসে উপস্থিত হ'ল। তার আঁচলে কতকগুলো আলু। উঠানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললে, আলু কতকগুলো এক জায়গা থেকে বাগিয়ে আনলাম বিনোদিদি। কিন্তু চা তো দেশ খুঁজে কোথাও মিলল না। এক খেত বাবুদের সেই ছোকরাটি, তা···

বিনোদিনী চাপাকণ্ঠে বললে, আস্তে।

—আস্তেই তো বলছি। তা সেই বাবুদের ছেলেটি।

বিরক্ত হয়ে বিনোদিনী বলল, মরুকগে বাবুদের ছেলে। তুমি যা এনেছ তাই দাও।

আলুগুলো ঢেলে দিয়ে রসময় বললে, তা মন্দ হবে না। সের খানেকের কম নয়। কি বল?

বিনোদিনী সাড়া দিলে না। ওদিকে ললিতা হেসে লুটোপুটি। তারাপদও থেকে থেকে গম্ভীর হচ্ছে, থেকে থেকে হেসে ফেলছে। খাওয়ার আয়োজন যে অতিথিকে লুকিয়ে করতে হয়, রসময় অত জানে না।

ললিতার হাসি দেখে রসময় রেগে বললে, কি? হাসছ যে? সের খানেক হবে না বলছ?

ললিতা আরও জোরে হেসে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনী এবং তারাপদও।

—তবে যা মন হয় তাই কর।

রসময় রেগে বেরিয়ে গেল।

হাসি থামলে তারাপদ বললে, এমন সাদাসিধে মানুষ আমি জন্মে কখনও দেখিনি।

গাঢ়কণ্ঠে বড়বৌ বললে, সে কথা একবার? মনটি গঙ্গাজলের মতো পবিত্র। একালের লোকের মতো খল কপট নয়। আর সব সময়েই হাসি, এতটুকু মলা-মাটি তো নেই।

তারাপদ সায় দিলে, সেই রকমই দেখছি।

—তুমি একদিন দেখছ? আমি এই ক'মাস ধ'রে দেখে আসছি। ওর রাগ নেই, রোষ নেই, হিংসে নেই, লোভ নেই, আপ্তপর ভেদ পর্যন্ত নেই। শিবের মতো মানুষ।

ললিতা চিমটি কেটে বললে, মিথ্যে বলিস না ভাই। লোভটুকু ঠিক আছে।

—কিসের?

—আর কিছুই নয়, আহারের।

বিনোদিনী হেসে বললে, তা একটু আছে। দু'একখানা ভালো তরকারির গন্ধ পেলে গুনগুন ক'রে গান বেরোয়। জল তো ফুটে গেল ঠাকুরপো, এখন কি করবে ক'রে নাও বাপু। ওসব আমি জানি না।

—এই যে যাই। —তারাপদ ও-ঘর থেকে সাড়া দিলে।

ললিতা চুপিচুপি বিনোদিনীকে বললে, তাঁতী বাড়ি থেকে ঘড়াটা এনেছিলি, দিয়ে এসেছিস?

জিভ কেটে বিনোদিনী বললে, এই যাঃ!

—আচ্ছা, আমি আসছি, তুই রান্না চড়া। —ললিতা ঘড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে তারাপদ গাঢ়স্বরে ডাকলে, বড়বৌ!

বিনোদিনীর বুক দুরুদুরু ক'রে উঠল। বুঝলে, এইবার সেই চরম মুহূর্ত এল। বিনোদিনী শক্ত হয়ে বসল। বললে, বল।

—হারাণদার কথা শুনেছ?

বিনোদিনীর শক্ত হয়ে বসাই সার হল। মুখের রক্ত পলকের মধ্যে কোথায় উড়ে গেল। শুষ্ককণ্ঠে বললে, না। বিয়ে করছে?

—বিয়ে! —তারাপদ হেসে বললে, তা জানি না।

—তবে?

একটু থেমে তারাপদ বললে, হাবল-মেনী মামার বাড়িতে রয়েছে। হারাণদা এখনও বাড়িতে রয়েছে বটে, কিন্তু কতদিন থাকবে জানি না। শরীর এই রকম হয়েছে।

তারাপদ একটা আঙুল নড়িয়ে দেখালে।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বিনোদিনী চুপ ক'রে ব'সে রইল। একটু পরে বললে, বাড়িতে থাকবে না তো কোথায় যাবে?

—পুরুষ মানুষের কি যাওয়ার জায়গার অভাব বড়বৌ? —তারাপদ ফিকা একটু হাসলে।

—তবু কোথায় যাবে, কিছু শুনেছ?

তারাপদ বুঝলে বিনোদিনী পরিহাস করছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললে, না। সে কথা কিছুই শুনিনি। আমার পক্ষে তোমাকে মুখ দেখানও যেমন শক্ত, হারাণদাকে মুখ দেখানও তেমনি। আমি বড় আনন্দেই আছি। সামনে পরীক্ষা, এখনও একখানা বই খুলতে পারলাম না।

তারাপদ দুঃখের সঙ্গে হাসলে।

বিনোদিনী কঠিনকণ্ঠে বললে, কেন, তোমার আবার দুঃখ কিসের?

মুখ নামিয়ে তারাপদ বললে, সে কথা তুমি নিজে না বুঝলে আমার সাধ্যি নেই বোঝাই।

একটা হাই তুলে বিনোদিনী বললে, নিজে আর কই বুঝতে পারলাম।

—আবার কি তোমার পায়ে ধরতে হবে বড়বৌ?

বিনোদিনী উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। বললে, আর ভয় নেই ভাই। এখন একবার ছেড়ে বিশবার পায়ে ধ'রলেও বিপদে পড়ব না।

লজ্জায় তারাপদ মুখ নত করলে।

একটু পরে বললে, এঁদেরও সাংসারিক অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। এখানেই বা তুমি কতদিন থাকতে পারবে জানি না।

—এদের অবস্থা ভালো হ'লেই বা আমার কি, মন্দ হ'লেই বা আমার কি? কারও দেওয়া-থোয়ার পিত্যেশ তো আমি করি না। তবে হ্যাঁ, আশ্রয় একটু চাই, মাথার ওপর একজন পুরুষও চাই।

তারাপদ বিস্মিতভাবে ওর দিকে চেয়ে রইল।

সেদিকে লক্ষ্য না ক'রেই বিনোদিনী বললে, ছরৎ যতক্ষণ আছে, ধান ভেনে হোক, জল তুলে হোক, দুখ-মেহনত ক'রে নিজের পেটের দু'টো ভাত যোগাড় করতে পারব। তবে হ্যাঁ, ভগমান এক আশ্রয়

যেমন নিয়েছেন, আর এক আশ্রয় তেমনি দিয়েছেন। ললিতা আমার মায়ের পেটের বোনের চেয়ে বেশী। আর রসময়কে তো চোখেই দেখলে।

জোরের সঙ্গে তারাপদ বললে, হোক। তবু এ পরের বাড়ি।

—যার নিজের বাড়ি নেই, তাকে পরের বাড়ি থাকতে হবে না? এ তো বড় আশ্চয্যি কথা! বিনোদিনী হাসবার চেষ্টা করলে।

হাতের বাটিটা ঠক ক'রে নামিয়ে রেখে তারাপদ বললে, ও কথা ব'ল না বড়বৌ। তোমার বাড়ি নেই?

—কই আর আছে?

—ও কথা বললে অধর্ম হয়। হারাণদা তোমাকে এমন কি কথা বলেছে বল তো?

বিনোদিনী নিরুত্তরে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল।

তারাপদ জোর ক'রে বললে, কিছুই বলেনি। স্বামী-স্ত্রীতে অমন ঝগড়া কত হয়। তার জন্যে কেউ কখনও নিজের ঘর-সংসার ফেলে চ'লে আসে না।

বিনোদিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, একথাও তুমি নিজে না বুঝলে কেউ বোঝাতে পারবে না।

—আমার বুঝেও কাজ নেই। —তারাপদ বললে, তুমি যাবে কি না বল?

—কোথায়? —বিনোদিনী হাসলে।

—কমলপুরে।

—তোমার বিয়ের সময় নিয়ে যেও, যাব।

তারাপদ হতাশভাবে নিশ্বাস ছাড়লে।

বিনোদিনী হেসে বললে, তা আর নিয়ে যেতে হয় না। সে সাহস হবে না। তখন বলবে: সমাজ ব'লে একটা জিনিস তো আছে। ক্রিয়া-কর্মের বাড়ি, একটা কথা নিশ্চয়ই উঠবে। তুমি মনে কিছু ক'র না বড়বৌ। বরং সকাল বেলায় দু'খানা লুচি পাঠিয়ে দোব।

—আমাকে তুমি তাই মনে কর ?

—তুমি ব'লে তো কথা নয়। সবাই তাই করবে। না ক'রে উপায় কি ? সমাজ একটা আছে। কলঙ্কিনীর হাতে কেউ খাবেও না! কি ক'রে খাওয়াবে ? গায়ের জোরে ? গায়ের জোর তোমার দাদার মতো ও তল্লাটে কারও নেই। তা তারই ওপর ভরসা করতে পারলাম না।

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে তারাপদ বললে, তুমি কলঙ্কিনী ?

রাগে, দুঃখে সে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

ওর চোখে জল দেখে বিনোদিনী উল্লসিত হয়ে উঠল। হাসি চেপে বললে, সেই রকমই তো দাঁড়াল।

—ও কথা ব'ল না বড়বৌ। তোমার কথা মনে হ'লে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়।

বিনোদিনী আর থাকতে পারলে না। জোরে জোরে হেসে ফেললে। বললে, তুমি এতও জান!

তারাপদ স্তব্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে বললে, আচ্ছা, আমাদের কথা ছেড়েই দাও। হাবল-মেনীর জন্যেও তোমার মন-কেমন করে না ?

বিনোদিনী চুপ ক'রে রইল।

তারাপদ আবার বললে, তাদেরও কি দেখতে ইচ্ছে করে না ?

মুখ তুলে শান্তকণ্ঠে বিনোদিনী বললে, সে কথা তোমারও শুনে লাভ নেই, আমারও ব'লে লাভ নেই।

তারাপদ আপন মনে বলতে লাগল, দুধের ছেলে, মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। আর যা মামী। আদর-যত্ন চুলোয় যাক, দু' বেলা পেট-পুরে দু'টো খেতে পাচ্ছে কি না কে জানে। হয়তো মুখ শুকিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে দেখবে বল ? একটা কঠিন অসুখও হয়ে যেতে পারে।

বিনোদিনী শিউরে উঠে বললে, চুপ কর। ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।

ওর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে তারাপদ ভয়ে চুপ ক'রে গেল।

বিনোদিনী যেন নিজেকে বোঝাবার জন্মেই বলতে লাগল, যাদের মা নেই, তারা কি আর মানুষ হয় না? হলই বা মামী খারাপ, দিদিমা তো এখনও মরেনি। সে বুড়ী বেঁচে থাকতে কার সাধ্যি ওদের অযত্ন করে?

দু'জনেই নিঃশব্দে নিজের নিজের কথা ভাবতে লাগল।

অবশেষে তারাপদ বললে, তুমি কি এইখানেই জীবন কাটিয়ে দেবে স্থির করেছ? বাড়ি আর যাবে না?

বিনোদিনী এবার রেগে গেল। তথাপি যথাসাধ্য সংযতকণ্ঠে বললে, কি এক কথা বারবার বল ঠাকুরপো। কোথায় যাব আমি? কোথাও যাবার মুখ কি রেখেছি?

—কেন, তুমি কি করেছ?

—কিছুই করিনি সে আমিও জানি। কিন্তু আমাব অদেষ্ট বিরূপ। স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করা আমার কপালে নেই।

খুব ধীরভাবে তারাপদ বোঝাবার চেষ্টা করলে, তুমি কোনো দোষ করনি। লোকের মিথ্যে নিন্দেয় তোমার ভয় কি? তুমি চল, আমি বলছি।

বিনোদিনী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বললে, তুমি বলবে ঠাকুরপো? আমি কি তোমার বাড়ি যাব? না তোমার ভরসায় যাব? যার বাড়ি যাব, সে কই?

তারাপদ একেবারে চুপ হয়ে গেল।

বিনোদিনী হঠাৎ গলা নামিয়ে বললে, আমি নিজের মনেই বল পাচ্ছি না। নইলে কারও ভরসা রাখি না। আমার শ্বশুরের ভিটে থেকে আমাকে তাড়ায় কে?

বিনোদিনী যেন লড়াই করবার জন্মে ভালো ক'রে বসল। কিন্তু তখনই তারাপদর চায়ের বাটির দিকে দৃষ্টি পড়তেই ওর শানান কণ্ঠস্বর

স্নেহসিক্ত হয়ে গেল। বললে, ও কি ঠাকুরপো! তোমার চা যে জুড়িয়ে গেল।

তারাপদ তাড়াতাড়ি বাটিটা মুখে তুলে নিলে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, জুড়িয়ে গেছে তো?

—না, বিশেষ জুড়োয়নি।

—আর জুড়োয়নি! আর একবার গরম ক'রে দোব?

—না, থাক। আচ্ছা, দাও।

বিনোদিনী হেসে ফেললে। বললে, বেশ লোক!

আবার সে কোথা থেকে কতকগুলো কাঠমুঠ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এল। তারাপদকে বললে, তোমার ফয়ের-বাক্সটা দাও তো?

তারাপদ পকেট থেকে দেশলাইটা বের ক'রে ফেলে দিলে। বিনোদিনী আবার উনান জ্বেলে চা গরম করতে দিলে। ললিতা বোধ হয় আড়ালেই কোথাও ছিল। এই সময় আত্মপ্রকাশ করলে। বিস্মিতভাবে বললে, এখনও তোমার চা খাওয়া হয়নি?

বিনোদিনী মুখ না ফিরিয়েই বললে, আর বলিস কেন! কোন কালে চা হয়েছে। উনি ব'সে ব'সে গল্প গিলছিলেন।

ললিতা সহাস্যে বললে, তাও ভালো। কুটুমবাড়িতে আবার খালি পেটে থাকতে নেই।

তারাপদ বললে, হ্যাঁ। আহারের বড় ত্রুটি হচ্ছে কি না, তাই ব'সে ব'সে আর কিছু না পেয়ে গল্প গিলব!

—দেখ দেখি গরম হয়েছে কি না।—বিনোদিনী বললে।

এক চুমুক খেয়ে তারাপদ খুশী হয়ে বললে, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। বেশ হয়েছে।

বিনোদিনী হেসে বললে, চা খাওয়া হ'লে এখান থেকে উঠতে হবে। রান্না চড়াব।

—নিশ্চয়। আমি তখন ও-ঘরে ব'সে ললিতা ঠাকরুনের গান শুনব। সেই রকমই কথা আছে তো?

ললিতা হেসে বললে, না। তা সে যাক, তুমি কিন্তু আমাকে ঠাকরুন ব'ল না।

—কেন?

—না। বলতে নেই। আমরা রাধারানীর দাসী। আমাদের ঠাকরুন বললে অপরাধ হয়।

তারাপদ পাল্টা প্রশ্ন করলে, আমাকে তাহ'লে বাবাজি বাবু মশায় বলেন কেন?

—বাবুকে বাবু মশায় বলবে না?

—না। আমি আবার বাবু কিসের? গায়ে একটা জামা থাকলেই বাবু হয়?

—নিশ্চয়।

—তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি! —চায়ের বাটিটা নামিয়ে রেখে তারাপদ বললে, চল, চল, তোমার ছু'খানা গান শোনা যাক ওই নিমতলায় ব'সে।

—আর আমার বুঝি রান্না-বাড়া নেই?

হতাশভাবে তারাপদ বললে, তবে আর কি করা যায়!

ললিতা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, গান শোনাবার লোক এখনি আসছে। কত গান শুনতে পার শুনো।

উৎসাহিত হয়ে তারাপদ বললে, তাই তো! বাবাজির কথা আমার মনেই ছিল না।

তারাপদ নিমতলায় ব'সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাবাজির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল, না বিনোদিনী সম্বন্ধে কি করা যায় তাই ভাবতে বসল, তা সেই জানে। ওর শূন্য দৃষ্টি এবং চিন্তিত মুখ দেখে মনে হ'ল বিলক্ষণ দ'মে গেছে।

॥ সাত ॥

সূর্য অস্ত গেছে।

দিনলক্ষ্মীর সীমন্তের সিন্দুর দেখতে দেখতে গেল মুছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার আসতে লাগল নেমে। শরতের সন্ধ্যা, শিশির পড়ছে দেখে তারাপদ উঠে গিয়ে দাওয়ায় বসল। দিবানিদ্রাটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সে জন্যে শরীরে কেমন একটা অবসাদ এসেছে। তারাপদ চোখ বন্ধ ক'রে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে রইল।

আবার কাল সকালে যাত্রা করতে হবে। মিথ্যে এসেছিল। এতটা পথ এত কষ্ট ক'রে যাওয়া-আসাই সার হ'ল। তবু একবার দেখাটা হ'ল,—বিনোদিনীর সঙ্গেও বটে, ললিতার সঙ্গেও বটে। এটুকুও দেখে গেল যে, বিনোদিনী এখানে মোটের উপর ভালোই আছে। সসম্মানে আছে, ঠিক নিজের বাড়ির মতোই। এও মন্দের ভালো বলতে হবে।

সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে বিনোদিনীর জেদটা অনেক বেশী। কিন্তু, তারাপদ ভেবে দেখলে, সত্যিই তো এখন আর তার বাড়ি ফেরার মুখও নেই। অকস্মাৎ গৃহত্যাগ ক'রে সে প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। এখন গৃহে ফিরে কি সন্তোষজনক কৈফিয়ত বা দিতে পারে? আর সে কৈফিয়তে বিশ্বাসই বা করবে কে? জোর গলায় তারাপদ যাই কেন বলুক না, অত্যন্ত কঠোর, অত্যন্ত নির্মম এবং অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত একটা সমাজ যে আছে, এ তো সুনিশ্চিত। হারাণ এবং

তারাপদ তার ফুৎকারে তুলোর মতো উড়ে যাবে। পঞ্চগ্রামী সমাজে তার হুঁকো বন্ধ হবে। ধোপা, নাপিত, পুরোহিত পর্যন্ত। তার চেয়ে সে ম'রে গেছে, না ম'রে গেছে। কে আর খোঁজ রাখে? ধীরে ধীরে তার স্মৃতি ভুলে যেতেও গ্রামের লোকের বেশী দিন লাগবে না। কুৎসাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। হাবল-মেনী বড় হয়ে যখন বাড়ি ফিরবে তখন আর বিনোদিনীর প্রসঙ্গ কেউ ভুলেও তুলবে না। যদি কখনও ওঠেও, তেমন আর ঘোঁট পাকবে না।

কিন্তু বিনোদিনীর অদৃষ্টে কি এই ছিল?

অকস্মাৎ রসময়ের হাঁক-ডাকে তারাপদ সচকিত হয়ে উঠল।

বেড়ার আগড় থেকেই রসময় হাঁকলে, কইগো, কোন দিকে গেলে? কেউ সাড়া দিলে না।

উঠান থেকে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে রসময় বললে, বাবু মশায় কোথায় গেলেন?

অন্ধকার দাওয়া থেকে তারাপদ সাড়া দিলে, এই যে।

—বিলক্ষণ! অন্ধকারে ব'সে আছেন? তামাকও পাননি বোধ হয় এক ছিলিম?

—দরকার হয়নি।

—আর দরকার হয়নি! আমি জানি কি না। ভদ্রলোক এলে যে একছিলিম তামাক দিতে হয়, আমাদের বাড়ির এরা তাও জানে না। আলোটা কইগো? সেটাও তো জ্বেলে দিলে পারতে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ললিতা ধমক দিলে, ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছ কেন? এই তো সন্ধ্যে হ'ল।

রসময় অমনি নরম হয়ে বললে, না চ্যাঁচাইনি। চ্যাঁচাব কেন? হুঁকো-কলকেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই বলছিলাম। এই পেয়েছি! এইবার তুমি সারারাত অন্ধকারে রাখ না কেন? কেউ কিছু বলতে যাবে না। কি বলেন বাবু মশাই?

ব'লে আপনমনেই হো হো ক'রে হেসে উঠল।

তারাপদও অন্ধকারে হাস্য গোপন করলে। এই অদ্ভুত-প্রকৃতি লোকটিকে সে যতই দেখছে ততই মন খুশী হয়ে উঠছে। বিনোদিনী যথার্থ কথাই বলেছে। রসময়ের মনটি অবিকল শিশুর মতো,—শুধু খেয়াল-খুশির উপর চলে।

ললিতা প্রদীপ জ্বেলে চৌকাঠের উপর রেখে দিয়ে আবার রান্নাঘরে চ'লে গেল।

খুশী হয়ে রসময় বললে, এই! মানুষের মুখ না দেখলে গল্প জমে! কি বলেন?

—তা বটে।

খানিকক্ষণ হুঁকো টেনে তারাপদর হাতে তার হুঁকো দিয়ে রসময় বললে, নিন, টানুন। আমি এইবার একটু উঠব। বিশেষ কিছু নয় মশাই, ভগবানকে ডাকাও হয় না, কিছুই না! শুধু একবার মনকে বোঝাবার জন্যে চোখ বন্ধ ক'রে বসা। যাব আর আসব। ঘটিতে পা ধোবার জল আছে নাকি? না ঘাটেই ধুতে যাব?

ললিতা রান্নাঘর থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিলে, ঘাট থেকে আবার কবে তুমি পা ধুয়ে এসেছ?

—তাই বলছিলাম। ঘটিতে জল আছে তো?

—আছে।

রসময় হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে জপে বসল। ঘরের দরজা সে বন্ধ ক'রে দিলে। বাউলদের ভজন অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং সেই সম্প্রদায়ের লোক না হ'লে জানবার উপায় নেই, এবং গুরুর আজ্ঞা ছাড়া জানাবারও উপায় নেই। এই গোপনীয়তা সকল ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা ক'রে চলে। কৌতূহলবশতঃ তারাপদ একবার উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। দ্বারে এতটুকু ছিদ্র নেই। ব্যর্থমনোরথ হয়ে তারাপদ আবার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে তাম্রকূট সেবন করতে লাগল।

ওদিকে রান্নাঘরে তখন রান্নার শব্দ উঠছে ছ্যাঁক ছোঁক।

—বাবু মশায়, ঘুমুলেন নাকি?

জপ শেষ ক'রে রসময় বেরিয়ে এল। অতিথির খাতিরে আজ সে খুব সকালেই জপ শেষ করেছে।

তারাপদ বললে, না ঘুমুইনি। বসুন।

—কই একটা শিকরেট দিন দেখি। দেখি কেমন লাগে।

তারাপদ তাড়াতাড়ি দেশলাই আর সিগারেট বের ক'রে দিলে।

দু'টো টান দিয়ে রসময় বললে, এর এই বাসটাই ভালো। যাকগে, বিনোদিনীর কি করছেন বলুন তো?

শেষের কথাগুলো সে চুপে চুপে বললে।

—কি করা যায় বলুন তো? হারাণদার অবস্থা তো নিজের দেখে এলেন?

—এলাম বৈ কি! ওর ঘর-সংসার দেখে আর ওর কথা শুনে চোখের জল আর রাখতে পারি না। ওদের সুখের সংসারে ভগবান কেন যে বাদ সাধলেন! কি হয়েছিল?

তারাপদ নিজের অংশ বাদ দিয়ে মোটামুটি ঘটনা বললে।

বিস্মিত হয়ে রসময় বললে, এই জন্যে এত কাণ্ড!

তারাপদ বললে, হারাণদার মাথা বোধ হয় ঠিক ছিল না। পাঁচ জনের সামনে স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত শুনে কার না মাথা খারাপ হয় বলুন? আমি অবশ্য জানি না। অনুমান করছি মাত্র।

রসময় যেন অন্যমনস্কভাবে কি একটা ভাবছিল। মৃদু হেসে যেন সেই চিন্তার জের টেনে বললে, বাবু মশায়, সংসারে খুন-জখম যত হয়েছে তার সাড়ে পনেরো আনার মূলে মেয়েরা। অথচ পুরুষ মানুষ যদি একটু ভেবে দেখত যে, মেয়েরা মহালক্ষ্মীর অংশ, তাই চঞ্চলা,—তাই কোনো একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না,—তাহ'লে সংসারের সাড়ে পনেরো আনা অশান্তির কারণ ঘটত না। তা তো বুঝবে না।

তারাপদ যেন হারাণকে সমর্থন করবার জন্যে বললে, তা কি পারে ? নিজের স্ত্রীর ···

রসময় হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, ওই তো মজা বাবু মশায়। গোল বাধিয়েছে ওই একটি কথায়। নিজের স্ত্রী, অ্যাঁ ?

রসময় মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগল। আর তারাপদ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

রসময় আবার বললে, নিজের স্ত্রী, অ্যাঁ ? এই স্ত্রীকে সে জন্মের সময় সঙ্গে ক'রে এনেছিল, কি বলেন ? আবার মরবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, নাকি বলেন ? তাহ'লে অবিশ্যি রাগ হবার কথাই বটে।

সে আবার তেমনি ক'রে হাসতে লাগল।

তারাপদ এতক্ষণ পর্যন্ত ওকে শুধু আমোদের বস্তু বলেই ধ'রে নিয়েছিল। তার এমনও মনে হয়েছিল যে, এ বাড়িব লোকরাও, মানে ললিতা এবং বিনোদিনী, তাকে নিয়ে আমোদই করে। কিন্তু ওর শিক্ষিত মন এখন হঠাৎ চমকে উঠল।

ধীরে ধীরে তারাপদ বললে, নয়তো আপনি কি মনে করেন ?

—আমি ! আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি ক্ষ্যাপা পাগল মানুষ। আমার কথায় তো আর সংসার চলবে না ?

—তবু ?

ললিতার সম্বন্ধে ওর মনের কথা জানবার জন্যে তারাপদর কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল।

—আমি কিছুই মনে করি না মশায়। তবে শুনতে যখন চাইলেন তখন বলি : নারী আমার কাছে শুধু সাধনার উপকরণ। ওরা প্রিকৃতির অংশ। ওদের নইলে পুরুষ সম্পূর্ণ হয় না। কথা হচ্ছে, ওরা নিজে বাঁধা না পড়লে, গায়ের জোরে বাঁধবার তো উপায় নেই।

রসময় শেষের দিকে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলতে লাগল,

আবার কি জানেন? ওদের পাপ নেই। মা গঙ্গার জলের মতো আপনা থেকেই পবিত্র। শুধু পুরুষকে উদ্ধার করার জন্যেই ওদের পৃথিবীতে আসা। মা গঙ্গার মতো। একেই বলে লীলা। আহা!

'রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

সে কেমন? না—

'মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥

শাস্ত্রে আর কি বলেছেন? না—

'রাধাসহ ক্রীড়া রসবৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥'

এই হ'ল পুরুষ আর প্রিকৃতিতে সম্বন্ধ। ওঁরা হলেন রসের উপকরণ। এই তো মশাই, আমি যা বুঝি।

এ সমস্ত কথা তারাপদর পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত নয়। সুতরাং রসময় বাবাজির মতন একজন প্রায় অশিক্ষিত লোকের মুখে এই সব কথা শুনে তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। চৈতন্য-চরিতামৃত তার পড়া নেই। থাকলে রসময়েরই উদ্ধৃত শ্লোক দিয়ে রসময়ের মুখ বন্ধ করতে দেরি হ'ত না। কিন্তু সে-তর্ক করার শক্তি তার ছিল না। বিশেষ তার ভাবালুচিত্তে এই ব্যাখ্যা যেন এক ঝলক আলোর মতো এসে পড়ল। বিরুদ্ধ তর্কের প্রবৃত্তিই হ'ল না। বরং পুরুষ ও নারীর এই সম্পর্ক সে শ্রদ্ধানত চিত্তে মেনেই নিলে। নারীকে শ্রদ্ধা করার এত বড় যুক্তি সে আর কোথাও শোনেনি।

সে শুধু একবার দ্বিধাভরে বললে, এই চোখে নারীকে দেখা কি সত্যিই সম্ভব হ'তে পারে?

রসময় হাত নেড়ে বললে, তা কি ক'রে বলব বলুন। এই যে আপনি পটপট ক'রে পাস ক'রে কলেজে পড়ছেন, আর আমার কাছে

পাঠশালার দরজা পেরুনই সম্ভব হ'ল না। আবার আমি হয়তো যেমন গান গাইতে পারি, আপনার পক্ষে হয়তো তেমন সম্ভব নয়। কার কাছে কোনটা সম্ভব, তা কি বলা যায় ?

তারাপদ আর থাকতে পারলে না। পট ক'রে বললে, এ রকম অবস্থায় পড়লে আপনি সহ্য করতে পারেন কি না জিগ্যেস করছি।

রসময় হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, এমন অবস্থায় এখনও পড়িনি বাবু মশায়। কাজেই জোর ক'রে বলা সাজে না। কিন্তু মনে হয় পারি।

চুপিচুপি বললে, ওর ওপরে আমার কোনোই দাবি নেই বাবু মশায়। কোনোদিন কোনো ব্যাপারে জোরও খাটাইনি, এ আপনি জিগ্যেস করে দেখতে পারেন। আমার আখড়ায় ও যে আছে, এ আমার পরম ভাগ্যি। কিন্তু ও যদি কোনো কারণে, কিংবা বিনা কারণে আমাকে ছেড়ে যায়, তার জন্যেও ওর ওপর রাগ করব না।

তারাপদ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। লোকটা সত্যি কথাই বলছে, না একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড!

রসময় আবার বললে, মোট কথা ওকে আমি খাঁচায় বন্ধ ক'রে রাখিনি। ইচ্ছা হ'লে ও যতদিন খুশি থাকতে পারে, আবার যখন খুশি উড়ে যেতেও পারে। এই আমার গুরুর আজ্ঞে।

ব'লে দুই হাত গুরুর উদ্দেশে কপালে ঠেকালে।

তারাপদ বললে, কিন্তু ভালবাসা যেখানে আছে সেখানে মান-অভিমান, দাবি-দাওয়া সবই আছে। যেখানে যত বড় ভালবাসা, সেখানে তত বড় জোর।

—ভালবাসা ? —রসময় জিভ কেটে বললে,—ভালবাসব ভগবানকে। আর সবই সেই ভালবাসার উপকরণ।

ও, তাই এই নির্মায়িকতা! রসময় তারাপদর শ্রদ্ধার আকাশ থেকে একেবারে ধপ ক'রে মাটিতে পড়ল। তাই নারীকে বেঁধে রাখতে চায় না।

তারাপদ বাঁকাভাবে জিজ্ঞাসা করলে, এই বুঝি আপনার গুরুর আজ্ঞে? মানুষকে বুঝি ভালবাসতে নেই?

রসময় সহজভাবেই বললে, আমরা উদাসীন বাউল। আমাদের একমাত্র ভালবাসার বস্তু রাধামাধব।

—আর এই ঘর-সংসার?

—ঘর-সংসার পাততে নেই।

—স্ত্রী-পুত্র-পরিজন? বন্ধুবান্ধব? আত্মীয়স্বজন? এ সব মায়া, নাকি? —তারাপদ মুখ টিপে হাসলে।

রসময় জিভ কেটে বললে, মায়া? আমরা তো মায়াবাদী নই বাবু মশায়।

—তাহ'লে ও-সমস্ত কি ব'লে ওড়াবেন?

—ওড়াব কেন? সব থাকবে। সবই যে আমার রাধামাধবের পুজোর উপকরণ।

একটু চিন্তা ক'রে তারাপদ বললে, তবে লোকে ঘর-সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় কেন?

রসময় সহাস্যে বললে, লোকের কথা আমি তো বলতে পারব না বাবু মশায়। আমরা উদাসীন বাউল, আখড়া ক'রে থাকি। এই আমাদের গৃহ, এই আমাদের বন। ঘর-সংসার আছে বললে আছে, নেই বললে নেই, যা বলবেন বলুন।

তারাপদ আবার গোলক-ধাঁধায় পড়ল। রসময় একটু একটু ক'রে আবার যেন তার শ্রদ্ধার আকাশে উঠতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ভগবানকে যে ভালবাসার কথা বললেন, সেও এই রকমই? না অন্য কিছু?

—এই রকমই, আবার অন্য কিছুও বলতে পারেন। —রসময় অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল। গুরু বলেছেন, আহা!

রাধা প্রেম বিভু, যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি!
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥

যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত॥

যাহা হৈতে সুনির্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার॥

তারাপদর বিস্ময় ক্রমেই বাড়তে লাগল। এই লোকটি অবলীলাক্রমে যে কথা ব'লে যাচ্ছে তার পক্ষে তা উপলব্ধি করাই শক্ত হয়ে উঠছে। তার মনে পড়ল বিবেকানন্দর সেই কথা, —এই দেশের নগণ্য একজন কৃষকও অত্যন্ত সহজে যে কথা বলে, তা বুঝতে অন্য দেশের লোকের সময় নেবে। তার মনে হ'ল কথাটা অত্যন্ত সত্য। একটা অত্যন্ত সুপ্রাচীন সুবিরাট সভ্যতা এই দেশের জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। দেশের মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যার যোগ সে এর কিছুটাও আপনা থেকেই নেবে—সেই কিছুটাও তারাপদর পক্ষে অনেকখানি। কারণ দেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ শিথিল হ'য়ে আসছে। সে পশ্চিমের বাতাসে নিশ্বাস নিতে শিক্ষা করছে। নীরবে সে সেই কথাই ভাবতে লাগল।

রসময় হঠাৎ বললে, বাবু মশায়কে একবার তামাক খাওয়াই। কি বলেন?

রান্নাঘর থেকে ললিতা বললে, আর তামাক খাওয়াতে হবে না। ভাত বাড়া হয়েছে।

—ব্যস, তবে আর কি! সকাল সকাল খেয়ে আসি চলুন। কি বলেন?

দু'জনে খেতে গেল।

পাশাপাশি দু'জনের খাবার জায়গা হয়েছে। তারাপদর বাপ বেঁচে আছে, তাকে দক্ষিণমুখে বসতে নেই। সে বসল পূর্বমুখে, রসময় দক্ষিণ মুখে। মধ্যে হাত দেড়েক ফাঁক। কেউ কারও ছোঁয়া খাবে না,

খেতে ব'সে ছোঁবেও না। রান্নাও ওদের পৃথক। রসময়ের পিছন দিকে ললিতার হেঁসেল, সেখানে সে ব'সে আছে। আর তারাপদর পিছনে বিনোদিনী।

দু'খানা বড় আঙট্ কলাপাতে দু'জনের ভাত দেওয়া হয়েছে চুর ক'রে। ফুলবড়ি দিয়ে শাকের ঘণ্ট হয়েছিল ও বেলায়। একপাশে তারই একটুখানি, আর বেগুন ভাজা। ভাতের মধ্যেখানে গর্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে ডাল। সেও ও-বেলার। টকও ও-বেলার। এবেলায় রান্না হয়েছে কেবল বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল, আর আলুপোস্ত।

দু'জনে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, ডাল ট'কে যায়নি তো?

—না, বেশ আছে। —তারাপদ উত্তর দিলে।

—তুমি আবার ঝাল বেশী খেতে পার না। ঝাল বেশী হয়নি তো?

—না, ঠিক হয়েছে। —হেসে বললে, তোমাদের এখানে পোস্তটা খুব চলে। না?

ব্যথিত হয়ে রসময় বললে, বলেন কি! অমন তরকারি আর আছে নাকি? যাতে দেবেন, আলু, পটল, ঝিঙে, লাউ—তরকারির স্বাদ ফিরিয়ে দেবে। টক করুন, তাও তেমনি চমৎকার। আর বড়ার তো কথাই নেই। আমার তো মশায় পোস্ত হ'লে আর কিছুই দরকার করে না।

তারাপদ মুখ নামিয়ে হাসি গোপন করলে।

ললিতা খোঁচা দিয়ে বললে, কেন, তোমাদের দেশে পোস্ত খায় না নাকি?

—খায়। তবে এত নয়। —উত্তরটা বিনোদিনী দিলে।

রসময় বললে, পোস্তটা আছে ব'লেই এখানে আছি। নইলে কোন দিন আখড়া তুলে দিয়ে দেশান্তরে চ'লে যেতাম।

ললিতা হেসে বললে, দেশান্তরে গিয়ে তো কচু খেতে?

বিনোদিনী ফোঁস ক'রে উঠল, কেন, কচু কি খারাপ জিনিস নাকি? বলে, অমৃতিভোগ-কচু লোকে আলু ফেলে খাবে।

—ও বাবা! —ললিতা ফিক ক'রে হেসে বললে, কচুর নাম আবার অমৃতিভোগ। তবেই হয়েছে! কচুপোড়া খেলে যা!

বিনোদিনী রেগে বললে, খাসনি তাই বলছিস। তোদের পোস্তর চেয়ে ঢের ভালো।

তারাপদর খুব আমোদ লাগছিল। বললে, আর আমাদের ফেনী বাতাসা বড়বৌ! হয় এ দেশে তেমন? এক একখানা এক একটি ধামার মতো।

বিনোদিনী বললে, হয়! তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি!

ললিতা হেসে বললে, বাতাসার আবার বড়-ছোট কি? যত বড়ই হোক, খেতে তো আর রসগোল্লার মতো হবে না।

তারাপদ চোখ স্থির ক'রে বললে, রসগোল্লার মতো! রসগোল্লা ফেলে খেতে হবে!

বিনোদিনী বললে, ওদের সঙ্গে কেন বকছ ঠাকুরপো? ওরা পোস্ত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। পোস্ত ভাজা, পোস্তর ঝাল, পোস্তর ঝোল, পোস্তর টক, আবার ক্ষীরপোস্ত!

সে জোরে জোরে হেসে উঠল।

বললে, পোস্তর বরফি হয় না ললিতা?

—হয় বৈ কি। তোর দেওরের জন্যে কাল তৈরি ক'রে দোব। খাবে তো তারাপদ?

ললিতার কথায় রসময়ের হাসি আর থামে না।

হাসি থামলে রসময় বললে, তা যাই কেন বল বাপু, ওদের দেশে মাছটা পাওয়া যায় প্রচুর। হারাণের পুকুরে তো···

হাতের গ্রাস নামিয়ে তারাপদ বললে, এবারে দেখেছেন? জলে-মাছে সমান। কাপড়ে ছেঁকে তোলা যায়।

উৎসাহের সঙ্গে বিনোদিনী বললে, এবার বর্ষায় পোনা কি কম ফেলা হয়েছে! পাউষের সময় ভাবলাম মাছ আর রাখা গেল না। দু'জনে দুপুর রাত পর্যন্ত বাঁধ পাহারা দিয়েছি। মোহনায় বাঁধ দিয়ে দিই, তবে মাছ আটকায়। খুব মাছ তাহ'লে হয়েছে!

এই সুসংবাদে বিনোদিনীর মনে যেন আর খুশী ধরছিল না। বললে, একটু মাছের টক রাঁধব, তা তেঁতুল কিনতে হ'ল এক পয়সার। আমাদের দেশে তেঁতুল কিনতে হয় কখনও শুনেছ?

—তেঁতুল! —বাঁ হাত তুলে তারাপদ বললে, বাবা! গাছের তলায় তলায় এত এত প'ড়ে। কুড়িয়ে নেবার লোক নেই। প'ড়ে পচছে।

বিনোদিনী খুশী হয়ে বললে, ললিতাকে শোনাও। ছুঁড়ি মরে হেদিয়ে এক ছড়া তেঁতুলের জন্যে।

ললিতা ঠোঁট উলটে বললে, মরে!

রসময় মুখ তুলে বললে, সে কি তেঁতুল বিনোদিদি? অমৃতিভোগ?

ললিতা জোরে জোরে হেসে উঠল। চাপা হাসিতে তারাপদরও সমস্ত শরীর থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল! কিন্তু দেশদ্রোহিতায় বিনোদিনী পাছে চ'টে যায়, এই ভয়ে কোনো রকমে নিজেকে সংযত করলে।

ওদের হাসি দেখে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বললে, হ্যাঁ, অমৃতিভোগ। তেমন তেঁতুল তুমি তো জন্মে দেখনি। তা ঠাট্টাই কর, আর যাই কর! কোন জিনিসটা হয় না আমাদের দেশে?

তারাপদ গম্ভীরভাবে বললে, তা বটে তো। বেগুনের সময় বেগুন, পটলের সময় পটল, সিমের সময় সিম।

বিস্ফারিত চোখে বিনোদিনী বললে, কি সিমটাই আমাদের বাড়িতে হয় ঠাকুরপো? আর কি বা তার সোয়াদ!

হাসি চেপে ললিতা বললে, অমৃতিভোগ সিম যে!

—বটেই তো। তোদের এখানে আছে কি? আমার ঘরের বেগুন গাছে বেগুন ধরে, শলি বেগুন,—মনে হয় যেন গা দিয়ে টসটস করে ঘি চোঁয়াচ্ছে। এখানে তেমন বেগুন একদিন চোখেও দেখলাম না। আচ্ছা, সেই গাছগুলোতে বেগুন ধরেছে কেমন?

তারাপদ একটু আমতা আমতা ক'রে বললে, ভালোই ধরেছে বোধ হয়!

উল্লসিত হয়ে বিনোদিনা বললে, আমার নিজের হাতে লাগান গাছ, জানিস ললিতা। গোছা গোছা বেগুন ধরে। চারটি গাছ থাকলে একটি সংসারে তরকারির ভাবনা ভাবতে হবে না।

বিনোদিনী সগর্বে ললিতার দিকে চাইলে। বললে, আমার বড় ঘরের পেছনের সেই জায়গাটাতে। কম গাছটা লাগিয়েছিলাম! কত রকমেরই শাক।

বিনোদিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

রসময় হঠাৎ বলে উঠল, তার আর চিহ্ন নেই বিনোদিদি।

হঠাৎ কে যেন বিনোদিনীর বুকে তীর মারলে। সে হঠাৎ চমকে গিয়ে স্খলিতকণ্ঠে শুধু বললে, চিহ্ন নেই!

—না। —রসময় ঘাড় নেড়ে বললে, বেগুন গাছও নেই, শাকও নেই, কিছুই নেই।

—কি হ'ল?

—তা জানি না। হয়তো জল না পেয়ে শুকিয়ে গেছে।

রাগে বিনোদিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, কেন, মিনসের হাতে কি পোকা পড়েছে নাকি? দিনে দু' ঘড়া ক'রে জলও দিতে পারে না।

রসময় অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, দিতে কি আর পারে না? দেয় না। কি জন্যে দেবে? কার জন্যেই বা দেবে? নিজের একটা পেট,—একদিন রাঁধে পাঁচ দিন খায়। চুকে গেল ঝঞ্ঝাট। তবে হ্যাঁ। পুকুরে মাছ হয়েছে

বটে। ওই যে বললেন, জলে মাছে সমান, তা কথা মিথ্যে নয়। আর কি মাছের টকই রেঁধেছিলাম!

ললিতা হেসে ফেললে।

চোখ বিস্ফারিত ক'রে রসময় বললে, হাসি নয়। মনে হয়েছিল, তোমার জন্যে একটু নিয়ে আসি, তোমার রান্নার অংখারটা কমুক।

ললিতা ভুরু নাচিয়ে বললে, তা আনলে না কেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে রসময় বললে, সেদিন বোধ হয় স্বয়ং মা দ্রৌপদী আমার হাতে ভর করেছিলেন। অমন মাছের টক আমি আজ পর্যন্ত কোথাও খাইনি।

ব'লে নিজের শুধু হাতাটাই প্রচণ্ড শব্দে চাটলে।

ললিতা অকারণে চ'টে গেল। অভিমানে ঠোঁট ফুলে উঠল। মুখ ফিরিয়ে ভারি গলায় বললে, সেই রান্নাটাই বরং শিখিয়ে দিও। কাল থেকে তেমনি করেই রাঁধব।

রসময় সটান বললে, আর তেমন হবে না। সেদিন কি এক আশ্চয্যি রকম উতরে গিয়েছিল।

কথাটা ব'লে ফেলেই সে বেকুব হয়ে গিয়েছিল। কথা বাড়াবার ভয়ে নিবিষ্ট মনে সশব্দে আহার করতে লাগল।

বিনোদিনী সেই যে পিছন ফিরে বসেছে আর এদিকে চায়নি। নত মুখে সে যে কি ভাবছে সেই জানে। রসময়েরও আর সাড়া নেই। তারাপদ এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক নিস্তব্ধতায় বিব্রত হয়ে একবার রসময়ের, একবার বিনোদিনীর এবং অবশেষে ললিতার মুখের দিকে চাইলে। উনানে তখনও আঁচ আছে। তারই আভা এসে পড়েছে ওর নিটোল দু'টি গালে, মসৃণ ক্ষীণ ললাটে। ঘনপল্লবভারাতুর চোখে ছায়া নেমেছে গাঢ়তর হয়ে। তারাপদ সমস্ত ভুলে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইল। ললিতা হঠাৎ ওর দিকে চেয়েই মুচকি হাসলে। ওর বাষ্পসমাকুল চঞ্চল চোখ আগুনের আভায় চিকমিক ক'রে উঠল। তারাপদও হেসে চোখ নামিয়ে নিলে।

রসময় হঠাৎ বললে, বিনোদিদি, বাবু মশায়কে আর দু'টি ভাত দাও।

বিনোদিনী যেন ধড়মড় ক'রে ঘুম ঝেড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, এই যে দিই। তুমি কি কুটুম নাকি ঠাকুরপো? চাইতে লজ্জা করছিল?

—না, লজ্জা নয়। কেবল চাইতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়।

—আর এমন সময়!

বিনোদিনী ওর পাতে ভাত দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, আর একটু টক দোব ঠাকুরপো?

—না, না। টক তো রয়েছে।

বিনোদিনী তবু ছাড়লে না। আর একটু মাছের টক ওর পাতে ঢেলে দিলে। বললে, শহরে থেকে থেকে তোমার খাওয়া একেবারে ক'মে গেছে।

—ব'ল না বড়বৌ, কম্‌ল আবার কোথায়?

—সে তুমি কি ক'রে বুঝবে? চেহারাও হয়েছে তেমনি। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। কেবল রঙটাই যা ফ্যাকাশে হয়েছে।

—বল কি!

তারাপদ ললিতার দিকে চাইলে।

ললিতা গম্ভীরভাবে বললে, আগের সে চেহারার তুলনায় অনেকখানি খারাপ হয়েছে।

কথাবার্তা এতক্ষণে আবার সোজা পথে নামল। হাসিতে, গল্পে বাকি সময়টা হালকাভাবেই কেটে গেল। ইতিমধ্যে সকলের অলক্ষিতে ললিতা ও তারাপদর মধ্যে কয়েকবার নিগূঢ় দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। পাঁচটা অবান্তর কথার মধ্যে শুধু চকিতে একবার ক'রে ভীরু চোখের চাওয়া। কিন্তু তাতেই উভয়ের মনে বিন্দু বিন্দু ক'রে রস জমতে লাগল, কচি ঘাসের ডগায় যেমন ক'রে জমে শিশির।

*　　　*　　　*

কিন্তু আর বেশীক্ষণ গল্প করা চলল না। এর পর আবার মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া, হেঁসেল তোলা আছে। রসময় এবং তারাপদ দাওয়ায় এসে পান-তামাক খেতে লাগল।

তারাপদ জিজ্ঞাসা করলে, আপনার আখড়া কি বরাবরই এইখানে?

—নাঃ মশায়, এদেশ চিনত কে? আমার আদি নিবাস নবগ্রাম। ললিতার মামার বাড়ি যেখানে।

—এখানে উঠে এলেন কেন?

রসময় ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা দেখা দিল। বললে, সে অনেক ব্যাপার।

—ও।—তারাপদ আর কৌতূহল দেখালে না।

কিন্তু মন্ত্রগুপ্তি ব্যাপারটা রসময়ের স্বভাববিরুদ্ধ,—যদি সেটা নিতান্তই ধর্ম-সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা না হয়, এবং গুরুর নিষেধ না থাকে। তারাপদ চুপ ক'রে গেল বটে, কিন্তু তার পক্ষে চেপে থাকা কঠিন হয়ে উঠল।

একটুখানি উসখুস ক'রে চুপিচুপি বললে, ব্যাপার আর কিছুই নয়। ললিতা যখন আমার কাছে এসে উঠল ···

বিস্মিতভাবে তারাপদ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—কেন, নবগ্রামে। তখনও কাক-কোকিল ডাকেনি, পথে-ঘাটে জন-মনিষ্যির সাড়া নেই। ও এসে আমার দরজায় টোকা দিলে।

তারাপদর বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। বললে, সে আবার কি!

রসময় সে কথার উত্তর না দিয়ে তেমনি চুপিচুপি আপন মনে বলতে লাগল, আমি তো চিরকালই একলা। দরজা খুলে দেখি মেয়েমানুষ! আমি তো ভয়ে আর বাঁচি না।

—তারপর?

—তারপরে চিনলাম, মেয়েমানুষ নয়, ললিতা। কি ব্যাপার ? ললিতা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বললে। সে তো সব জানেনই।

—কিচ্ছু জানি না।

—আগে একবার ওর মালাবদল হয়েছিল, জানেন না ? অবলা মেয়েমানুষ পেয়ে লোকটা কি অত্যাচারটাই না করত ! আহা !

তারাপদ জিজ্ঞাসা করলে, আপনাকে ও চিনলে কি ক'রে ?

—আমাদের গাঁয়ে ওর মামার বাড়ি যে! চেনাশোনা থাকবে না ? আপনিও দেখছি নিতান্ত ছেলেমানুষ। কিছুই বোঝেন না।

এতক্ষণে তারাপদ বুঝলে। শুধু চেনাশোনা নয়, তারও অতিরিক্ত পরিচয় ছিল দু'জনের।

রসময় বললে, সেই ভোরেই দু'জনে পালিয়ে এলাম এখানে।

—পালালেন কেন ?

—ওখানে আর থাকা হয় ? পাশেই ওর মামার বাড়ি !

—কিন্তু আপনাদের সমাজে ফের মালাবদল তো চলে।

—তা চলে। কিন্তু কি জানেন, —রসময় হেসে বললে, পাত্রটি তো খুব সুপাত্র নই। না চাল, না চুলো।

রসময় হো হো ক'রে হেসে উঠল।

ও-ঘর থেকে ললিতা বললে, অত হাসি কিসের গো ? আমাদের যে হিংসে হচ্ছে। দাঁড়াও আমরা যাই, তারপরে হেস।

—তোমাদের দেরি কত ?

—আর দেরি বেশী নেই। ততক্ষণ হাসাহাসি একটু ধামাচাপা দিয়ে রেখে দাও।

—তাই রইল। তোমরা দেরি ক'র না।

রসময়কে বললে, তা তো হ'ল। কিন্তু বড়বৌ তো কিছুতে যেতে চাইছে না। তার কি করা যায় !

চিন্তিতভাবে রসময় বললে, তাই তো। আমি বলি কি ...

—বলুন।

—আমার যাওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া আমার বাড়িতেই রয়েছে, আমার যাওয়াটা ভালোও দেখায় না। কি বলেন?

উত্তর দেওয়া কঠিন।

তারাপদ বললে, কোথায় যেতে চান, বলুন না?

—বিনোদিদির বাপের বাড়ি।

—তারা যদি নিয়ে যায়? তা মন্দ বলেননি।

তারাপদ চিন্তিতভাবে বললে, আমার একদিন অবশ্য কলেজ কামাই হবে। তা হোক। সে কি এখান থেকে খুব বেশী দূর?

—নাঃ, খুব বেশী আর কি! বলে সাত ক্রোশ, কিন্তু তার চেয়ে বেশীই হবে।

আবার সাত ক্রোশ! কাল যে রাস্তা হেঁটেছে, তারই ব্যথা এখনও মরেনি। তারাপদর মুখ শুকিয়ে গেল।

রসময় বললে, আপনি তো এখন শহরেই ফিরবেন?

—শহরে ফিরব।

—তাহ'লে সুবিধা আছে। —রসময় একগাল হেসে বললে, এদিকে আপনাকে আট ক্রোশের বেশী হাঁটতে হবে। ওদিকেও প্রায় তাই। ওদের গাঁয়ের কোলেই ইস্টিশান, আধ ক্রোশের মধ্যে।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ।

তারাপদ বললে, তাহ'লে আমি ওই দিক দিয়েই যাব। একটু ঘুরতে হবে, তা হোক।

রসময় চুপিচুপি বললে, কিন্তু সেখানেও কথাটা আস্তে আস্তে পাড়বেন। তারাও জানে কি না যে, বিনোদিদি নেই।

—সে বলতে হবে না। কিন্তু তার চেয়ে সরাসরি বিনোদিদির মাকে বলাই ভালো। কাজ কি পাঁচ কান ক'রে!

তারাপদ ভেবে দেখলে সেই ভালো। কাল ভোরে যাওয়া আর হবে না। একটু সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে বের হ'লে সন্ধ্যের মধ্যে

ওখানে পৌঁছন যাবে। তারপর রাত্রের ট্রেনে সটান শহর। সেখানে গিয়ে খাওয়া চলবে না। অবশ্য বিনোদিনীর মা এবং দাদা তার একেবারে অপরিচিত নয়। হাবলের অন্নপ্রাশনের সময় তারা যেন এসেছিল ব'লে স্মরণ হচ্ছে। সে অনেক দিনের কথা। তবু দেখা হ'লে সম্ভবতঃ পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারবে। আর না পারলেই বা কি! সে তার বলবার কথা ব'লে চ'লে যাবে। সে তো বিনোদিনীর নিজের দাদা। যা কর্তব্য মনে হবে করবে।

—কিন্তু হারাণদাকেও কি জানান উচিত নয়?

—সেইটেই ঠিক করতে পারছি না। সেই উদ্দেশ্যেই কমলপুর যাওয়া। কিন্তু হারাণের গতিক দেখে আর কিছু বলতে পারিনি। ভেবেছিলাম, ললিতার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করব। তা, সে আর ঘ'টে উঠল না।

তারাপদ বললে, আমার মনে হয় ···

—জানানই ভালো? আমারও তাই মনে হয়। বাবু মশায়, ওদের যে কি নিয়ে ঝগড়া সে ওরাই ভালো জানে। আপনি আমি মাথা খুঁড়লেও হয়তো ও নুইবে না। কিন্তু কে জানে, হারাণ একবার এলেই হয়তো মিটে যাবে। স্ত্রী-পুরুষের ঝগড়া তো?

রসময় হো হো ক'রে হেসে উঠল।

—কি অত হাসি! আমরা একটু ভাগ পাই না?

বিনোদিনী এবং ললিতা দু'জনে দাওয়ার এক পাশে এসে বসল। মাটির প্রদীপটা চৌকাঠে মিটমিট ক'রে জ্বলতে লাগল—এক পাশে। তারই খানিকটা আলো এসে পড়ল তারাপদ এবং রসময়ের অঙ্গে। এদিকটার, অর্থাৎ ললিতা এবং বিনোদিনীর দিকটার অন্ধকার একটু ফিকা হ'ল মাত্র।

রসময় বললে, বাবু মশায় কাল যাবেন বলছেন।

বিনোদিনী হেসে বললে, তারপরে?

—তারপরে কি হবে তোমরা দেওর-ভাজে বোঝাপড়া কর।

তারাপদ বললে, কালকে আমাকে যেতেই হবে বড়বৌ। আমার কলেজ তো এখনও বন্ধ হয়নি।

—তবে এলে কেন ?

—এলাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। আবার কি !

ললিতা ফিসফিস ক'রে কি যেন বিনোদিনীর কানে কানে বললে। বিনোদিনী বললে, সে আর বলতে ! সাত দিনের মধ্যে নয়।

আশঙ্কিত হয়ে তারাপদ বললে, চুপিচুপি আবার কি পরামর্শ হচ্ছে ? না, না। কাল আর আমি কিছুতে থাকতে পারব না।

—বেশ তো !

ললিতা মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, আমরা এলাম তোমার কাছে গল্প শুনতে। এর মধ্যে 'যাই যাই' কথা কি ?

—গল্প শুনতে ? তাই বটে ! বরং আমিই এসেছি তোমাদের গান শুনতে। বড়বৌ, তুমি কিছু গান-টান শিখলে নাকি ?

—শিখেছি।

—বেশ, বেশ। তবে আর লোকে সাধুসঙ্গ করতে বলে কেন ? কি গান শিখলে ?

ললিতা চট্ ক'রে বললে, ঢেঁকির গান।

—বেশ ! বেশ ! তাই একটু শোনাও।

ললিতা বললে, সে এখন হবে না। কাল সকাল থেকে শুনবে।

বিনোদিনী তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, আঃ ! ললিতা, কি ইয়ার্কি করিস !

ললিতা মুখ নেড়ে বললে, সত্যি কথা বলব না ?

—আ হা !

তারাপদ বললে, বড়বৌএর ঢেঁকির গান তো সকাল থেকে শুরু হবে। আর এখন ?

ললিতা আবার বিনোদিনীর কানে কানে কি যেন বললে। উৎসাহিত হয়ে বললে, সেই ভালো। খেলবে ঠাকুরপো, গোলোকধাম।

সুদামের একটা গোলোকধামের ছক এখানেই থাকে। স্কুল পালিয়ে, কিংবা রবিবার দুপুরে এসে খেলে যায়। লজ্জার বালাই নেই। কাজ না থাকলে সেও ব'সে যায় ওদের সঙ্গে। পারে না বিনোদিনী। অথচ এই খেলায় তার উৎসাহ ষোলো আনার উপর আঠারো আনা। কতদিন খেলেনি তার ঠিক নেই। তারাপদ এসেছে, এ সুযোগেও যদি খেলা না হয়, আরও কতকাল যে হবে না কে জানে।

তারাপদর অবশ্য এত মেয়েলি খেলায় উৎসাহ নেই। কিন্তু প্রথমতঃ, দিনে এত বেশী ঘুমিয়েছে যে রাত্রে সহজে নিদ্রার আশা নেই। দ্বিতীয়তঃ, ললিতার সঙ্গ সে এত শীঘ্র ছাড়তে রাজী নয়।

বললে, বেশ তো! তাই হোক খানিকক্ষণ।

শুনেই রসময় একটা হাই তুললে। ক্লান্তভাবে বললে, আমাকে তা'হ'লে ছুটি দিতে হবে বাবু মশায়। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

তারাপদ বললে, বলেন কি! এই তো সবে সন্ধ্যে! এরই মধ্যে ঘুম এল নাকি?

শ্রান্তকণ্ঠে রসময় বললে, সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি ক'রে ···

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বললে, তাই যাও। তোমার মতো বেরসিক নিয়ে আমাদের জমবেও না।

রসময় খুশী হয়ে ঘরে গেল। কিন্তু ঘুমুতে পারলে না। ওদের খেলা চলল রাত বারোটা পর্যন্ত। তার সঙ্গে যত হাসি, তত চীৎকার। রসময় শুয়ে শুয়ে কেবল এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। মাঝে মাঝে ওদের হাসির চোটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এসে খবর নেয়, হাসির কারণটা কি। শোনে— হয় বিনোদিনী, নয় ললিতা, নয় তো তারাপদ তিন তালা থেকে একচান্সে সটান নরকে এসে পড়েছে।

রসময় বলে, ওই নরকের ভয়েই তো ও-খেলা খেলি না। এমনিতেই যথেষ্ট নরক ভোগ হচ্ছে, আবার কেন?

রসময় আবার বিছানায় গিয়ে শোয়। আবার কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলে, আর খেলে না। রাত হয়েছে কম! বাবু মশায় কাল সমস্ত রাত জেগে এসেছেন, ওঁকে একটু ঘুমুতে দাও।

কিন্তু কে তার কথা শোনে! বিনোদিনীর চেপেছে খেলার নেশা। আর তারও চোখের অন্তরালে এদের দু'জনের কিসের নেশা চেপেছে সে শুধু এরা দু'জনই জানে। বিনোদিনীও জানে না, রসময়ও না।

সে আরও দু'একবার খেলা বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রে অবশেষে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ আট ॥

সাতদিন অবশ্য নয়,—কিন্তু কি কারণে জানি না তারাপদ সত্যি সত্যিই পাঁচ দিনের মধ্যে যেতে পারল না। হয়তো সাত দিনই থেকে যেত, কিন্তু সাত দিন পরেই কলেজ বন্ধ হবে, সঙ্গে সঙ্গে হস্টেলও। সুতরাং তাকে যেতেই হ'ল বিনোদিনীর বাপের বাড়ি হয়ে শহরে।

এই পাঁচটা দিন যেন চক্ষের পলকে উড়ে গেল। সুদামের দলও এসে জুটছিল। কলেজের ছেলের সঙ্গে একাসনে তামাক খেতে পাওয়ার লোভ বড় কম নয়। এদের অত্যাচারে রসময় নিজের বাড়িতেই অবাঞ্ছিত অতিথির মতো হয়ে উঠেছিল। সে যে কখন যায়, কোথায় শোয়, কেউ আর সে খবর রাখারও অবকাশ পায়নি। রসময়েরও ঝঞ্ঝাট নেই। তাকে দু'টো খেতে দিলে খাবে, না দিলে নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করবে। এদের ব্যাপার দেখে সে ভজন-পূজার সময়টা দিয়েছিল বাড়িয়ে। বাকি সময়টা ভিক্ষায় বের হ'ত। ফিরতো বেলা গড়িয়ে গেলে।

বোর্ডিং থেকে সুদাম তার স্টোভটা এনেছিল। সকালে আরম্ভ হ'ত হালুয়া আর চা। তারপরে আড্ডা বসত তাস-পাশা-দাবার, বেলা দশটা পর্যন্ত। বিকেলে কোনোদিন নদীর ধারে বেড়ান, কোনোদিন আমবাগানে ব'সে বিবিধ সঙ্গীতচর্চা, ডিঙিতে বাচ খেলা, আবার কোনোদিন গাছের ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথা। মালাগুলো নিয়ে তারাপদ কি করেছে তা সেই জানে।

মোটকথা দৃষ্টিমাত্র তারাপদ সুদাম-রাধিকার দলের চিত্ত জয় ক'রে নিয়েছিল। তার কাপড়-জামা-জুতা, তার কলেজের নানাবিধ গল্প, তার আচার-ব্যবহার চালচলন তাকে এক মুহূর্তে এদের দলের দলপতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করলে। ওর বসবার ভঙ্গি, দাঁড়াবার ভঙ্গি, চলবার ভঙ্গি, ওর কোট শার্টের কাট্, কাপড় পরার ধরন, ওর নতুন ধরনের জুতা, ওদের আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠল। কেউ কেউ অনেকখানি আয়ত্তও ক'রে নিলে। যে ক'দিন তারাপদ ছিল, সে ক'দিন ওরা কি ক'রে যে ক্লাস করেছে ওরাই জানে। নিধুবনে কৃষ্ণের বাঁশী বেজে উঠলে ব্রজগোপীদেরও বুঝি গৃহকর্ম করতে এতটা কষ্ট হয়নি। ওদের দেহ বাঁধা ছিল স্কুলে, কিন্তু মন থেকে থেকে ছুটে চলত নিমতলার সেই উঁচু বেদীটিতে, কিংবা ময়ূরাক্ষার ধারে, কিংবা ছায়াসুনিবিড় আম্রবনে। ব্রিজ খেলাটা ইতিপূর্বে এদেশে আসেনি। তারাপদর কাছে খেলাটা শেখা পর্যন্ত ওদের এমন নেশা ব'সে গেছে যে, আর অন্য কিছুতে মনই বসে না।

আর এতগুলো শান্তশিষ্ট ছেলের সমস্ত উপদ্রব অজস্রধারায় ব'য়ে গেছে হু'টি মেয়ের উপর দিয়ে,—বিনোদিনীর আর ললিতার। বিনোদিনীর ঢেঁকির গান এদের উৎপাতে বন্ধই ছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা, আর তার সঙ্গে একটা-না-একটা অনুপান আছে। সুখের মধ্যে এইটুকু যে, এই উৎপাতের ব্যয় বহন বিনোদিনীকে করতে হয়নি। হ'লে সে দেউলিয়া হয়ে যেত। কিন্তু তা না হ'লেও দৈহিক পরিশ্রম তো আছে। এতদিন পর্যন্ত এদের সামনে সে ভালো ক'রে বেরুত না। এমন কি ওদের সঙ্গে ললিতার অত ঘনিষ্ঠ রসালাপও পছন্দ করত না। অনেকবার সে কথা স্পষ্ট ললিতাকে বলেছেও। এবারে তারাপদর কল্যাণে সে আড়াল গেল উড়ে। বাধ্য হয়ে তাকে সামনে বেরুতে হ'ল, কথাও কইতে হ'ল এবং ক্রমে ক্রমে তারাপদর সম্পর্কে বড়বৌ ব'লে ওরা কিছু রসিকতা করলে তার উত্তরও দিতে হ'ল।

—আড়াল থাকে কি ক'রে?

ললিতা কিছু আর সব সময় থাকতে পারে না। কেউ এল এক রাশ পাঁপর আর এক বাটি তেল নিয়ে।

—বড়বৌ, এগুলো চটপট ভেজে দাও তো দেখি। আর একটু চা-ও কর। চিনি আছে তো? না থাকে এনে দি।

বড়বৌকে চা আর পাঁপরভাজা ক'রে দিতে হয়।

সুদাম এল সেরখানেক বেশন আর গোটা কয়েক বেগুন নিয়ে। বেগুনগুলো বোধ হয় আর কেনেনি, এ-দিক ও-দিক থেকে সংগ্রহ করেছে। বললে, তুমি ততক্ষণ বেশনটা ফাঁট বড়বৌ, আমি তেল নিয়ে আসি। হাত জোড়া ছিল ব'লে তেলটা আর আনতে পারিনি। ও হো! একটা বাটি দাও তো। তেল আনব কিসে?

বেগুনি হ'ল। তার সঙ্গে চা।

একদিন তো ডিমই এল। আর একদিন মাংস। এসব ব্যাপার রসময়ের আখড়ায় হবার উপায় নেই। বিনোদিনী এবং ললিতাও ছোঁয় না। আমবাগানে স্টোভে ওরা নিজেরাই রেঁধে নিলে। সুদাম পাকা রসুয়ে। পড়াশুনার চেয়ে এই সব কাজেই তার প্রীতি বেশী। উৎসাহও যথেষ্ট, পারেও ভালো।

বিনোদিনীর হেঁসেল থেকে এল ভাত ডাল একটা তরকারি আর মুসুরির ডালের বড়ির টক। কার গাছ থেকে চুরি ক'রে একগাদা আঙট-কলার পাতা কেটে এনে আমগাছের তলায় ছায়ায় ছায়ায় ব'সে ওরা সমস্ত দিন ধ'রে খুবই উৎসব করলে।

আনন্দ বিনোদিনী এবং ললিতারও কম হ'ল না। সুদাম-রাধিকা ব্রাহ্মণ-সন্তান। বিনোদিনী প্রথমে নিজের হেঁসেলের ভাত ওদের দিতে কিছুতে রাজী হয়নি। কিন্তু যখন জানলে ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও বিনোদিনীর হাতে খেতে ওদের আপত্তি নেই এবং বিনোদিনী রেঁধে না দিলে ওদের আর সে বেলা ভাত জুটবে না, তখন বাধ্য হয়ে রাঁধতে হ'ল। কিন্তু তিন সত্যি করিয়ে নিলে এর জন্যে যদি কিছু পাপ হয় সে ওদের, বিনোদিনীর নয়।

বোর্ডিং থেকে আনা হয়েছিল কতকগুলো বাটি। বাটিতে বাটিতে মাংস নিয়ে ওরা পাতা পেড়ে ব'সে পড়ল। ললিতা আর বিনোদিনী কোমরে কাপড় জড়িয়ে ওদের ভাত-ডাল-তরকারি পরিবেশন করলে। সে যে কি আনন্দ! ছায়ার জন্যে ওদের বসতে হয়েছে দূরে দূরে এক একটা গাছের তলায়। আর ওদের ঘনঘন তাগিদ মেটাবার জন্যে বিনোদিনী আর ললিতাকে ছুটে ছুটে পরিবেশন করতে হচ্ছে। ওদের দু'জনের ছুটোছুটি দেখে এদের হাসি আর ধরে না। বহুকণ্ঠের হাসিতে আর কলরবে এতদিনকার স্তব্ধ, শান্ত আমবাগান মুখর হয়ে উঠল।

এতদিন পর্যন্ত বিনোদিনীকে ওরা মনে মনে ভয় ক'রে চলত। ওর ভাবলেশহীন কঠিন মুখভাব, বিরক্তিপূর্ণ ঔদাসীন্য, দৃপ্ত ঋজু গতি-ভঙ্গি এবং ছেলেদের কাছ থেকে দূরত্ব রক্ষার প্রয়াসের জন্যে ছেলেরা ওকে দেখলেই সঙ্কুচিত হ'ত। এমনকি বাড়িতে ললিতা না থাকলে ওরা ওকে দেখেই স'রে পড়ত। তামাক পর্যন্ত ইচ্ছা করত না। এই তপস্বিনীর মতো কৃচ্ছ্রসাধিকার শুধুমাত্র উপস্থিতিই ওদের অস্বস্তির কারণ হ'ত। ওকে ওরা সহজ এবং স্বাভাবিক মানুষ বলেই ভাবতে পারত না।

ভাবল প্রথম এই আমবাগানের উৎসবের দিন থেকে। দেখলে সেও ললিতার মতো হাসে, খেলে, ছুটোছুটি করে। হাওয়া লেগে ললিতার মতো ওরও ক্ষণে ক্ষণে আঁচল পড়ে লুটিয়ে, মাথার ঘোমটা যায় খ'সে, শিথিল কবরী খুলে গিয়ে কালো এলোচুল ওড়ে বাতাসে। উল্লাসে, কৌতুকে চপল চোখ বিদ্যুতের মতো ঝিকমিকিয়ে ওঠে। পুলকে লহরে লহরে ওঠে কলকণ্ঠ। লঘু পায়ে ললিতারই মতো চটুল ছন্দ বাজে। এতদিন যাকে দেখে তারা শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, ভয়ে সঙ্কুচিত হ'ত, অকস্মাৎ খুশীর সঙ্গে আবিষ্কার করলে সেও ললিতারই মতো একটি নারী। কিছুই তফাত নেই। তফাত ছিল শুধু ঘোমটায়। সেইটুকু খ'সে যেতেই সব সমান হয়ে গেল।

এখন তারা একে একে আসে মলিন মুখে। ললিতা ডাকে। এখন আবার বিনোদিনীও ললিতার মতো ক'রে ডাকে।

বলে, এস এস, সুদাম সখা এস। ও কি শ্রীমতী রাধারানীও যে! আগুন নেবে?

ওরা ধুপধুপ ক'রে মেঝের উপরই ব'সে পড়ে। বলে, আর বড়বৌ, তারাপদদা' চ'লে যাওয়াতে এ-বাড়ি যেন কানা হয়ে গেছে।

রসময় অবাক হয়ে বলে, সে কি হে! তিনি বিদেশী মানুষ। দু'দিনের জন্যে এসেছিলেন, আবার চ'লে গেছেন। তাঁর জন্যে আমার এমন সাধের আখড়াই কানা হয়ে গেল?

—তা বললে কি হয় বাবাজি। এক একজন লোকের একটা লগ্ন থাকে। যেখানে যায়, দু'দিনের জন্যে গেলেও জমিয়ে ফেলে। তারাপদ দাদা সেই রকমের লোক। বুঝলে?

রসময় হেসে বললে, ও বাবা! এর মধ্যে দাদাও হয়েছে। আর আমি এখানে এতদিন থাকলাম, তবু যে বাবাজি, সেই বাবাজি! লগ্ন একটা আছে বটে।

রাধিকা বললে, এখন এমন হয়েছে বাবাজি, যে মনে হচ্ছে ছুটিটা হয়ে গেলে বাঁচি।

—কেন, ছুটি হ'লে তুমি আবার কি চতুর্ভুজ হবে?

—চতুর্ভুজ নয় হে বাবাজি, চতুর্ভুজ নয়। ক'দিন খুব হৈ হৈ করার পর হঠাৎ যেন কেমন মিইয়ে গেল। এখানে আর ভালো লাগছে না।

ওদের কথা শুনে বিনোদিনীর চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। বলে, তোমাদের ইস্কুল খুললে আবার তাকে আসতে লিখব। নিশ্চয় আসবে।

—লিখবে? আমাদের কাছেও ঠিকানা দিয়ে গেছে। আমরাও লিখব। আর তো কিছু নয় বড়বৌ, এই জায়গাটা ইস্টিশান থেকে এত দূর যে, লোকে ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারে না।

মাথা নেড়ে বিনোদিনী বললে, সেই তো! আর ঠাকুরপো যে একেবারে তুখসই নয় কি না! এইটুকু হেঁটে এসে পরের দিন আর উঠতে পারে না। ওকে আসতে বলাও বিপদ কি না।

রসময় বললে, চিঠি আসার এখনও সময় হয়নি, না বিনোদিদি?

—আজ নিয়ে চারদিন হল।

—তা'হলে আজ আসতে পারে।

রসময় কিন্তু অন্য কথা ভাবছিল। তারাপদর বিনোদিনীর বাপের বাড়ি হয়ে যাওয়ার কথা। ফলাফল কি হ'ল জানার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। গিয়েই পত্র দেবার কথা সে বলেও গেছে।

রাধিকা হঠাৎ হেসে বললে, তোমার সুদাম সখা সেদিন কি করলে জান বড়বৌ?

—কি করেছে?

সুদামও তামাক খেতে খেতে আড়চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে। সে আবার এর মধ্যে কি করে বসল?

রাধিকা বললে, বলব?

সুদাম একটু ভেবে চিন্তে বললে, কি আবার করেছি? সেই মাস্টারের তামাক চুরির কথা?

—না, না। সেই যে···হর্ষবর্ধনের বোনের নাম···

সুদাম একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, তাই বল। তা বল্‌না কেন?

রাধিকা বললে, জান বড়বৌ, সেদিন মাস্টার ওকে জিজ্ঞাসা করলে হর্ষবর্ধনের বোনের নাম কি? ও পট করে বললে, টু-ক্লাব্‌স্। আর কি মারটা না খেলে! বাপ!

বিনোদিনী সবিস্ময়ে বললে, সে আবার কি!

—বুঝতে পারলে না?

রাধিকা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই ওরা দু'জনে এমন হেসে উঠল যে, সে হাসি আর থামে না।

বিনোদিনী বললে, ও হরি! সুদাম সখা, তুমি বুঝি ইস্কুলে বসেও তাসখেলার কথা ভাব ?

অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললে, ব্রিজখেলার কি যে নেশা বড়বৌ, সে তুমি বুঝবে না। আমি তো রাত্রে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখি।

তারাপদ আসার ফলে ছেলেরা যেমন বিনোদিনীকে পেলে, তেমনি বুঝি ললিতাকে হারায়। এই ক'দিন তার অকস্মাৎ কাজ যেন বেড়ে গেছে। নদীর ঘাট থেকে জল আনছে তো জলই আনছে। তার আর শেষ নেই। রান্নার জল, খাবার জল যদি হ'ল তো গাছে দেওয়ার জল চাই। রসময়ের নিজের এবং বিনোদিনীর কাপড়গুলো অব্যবহার্য রকমের ময়লা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো সাজিমাটি দিয়ে ঘাটে একটা পাটা নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন ধ'রে কাচলে। আলখাল্লার জন্যে রসময়কে বিনোদিনী যে কাপড়খানা কিনে দিয়েছে, সেটা শেলাই যদি হ'ল তো রঙ করা আছে। এর উপর রান্নাবাড়া, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ তো আছেই। এই সবের উপরে চেপেছে রসময়ের আঠারো ইঞ্চি পরিমিত ফাটা ফাটা দু'খানি চরণ কমল। প্রত্যহ সে দু'টিতে ব্যথা করছে, আর ললিতা টিপে টিপে তেল মালিশ ক'রে সায়েস্তা করার চেষ্টা করছে। তাছাড়া দরকার পড়লে বিনোদিনীর ঢেঁকিতেও দু'টো পাড় দিয়ে আসছে, পা দিয়ে ধানগুলো মেলেও দিচ্ছে।

রাধিকা একদিন বললে, এতগুলো লোকের মধ্যে লোক যদি কেউ থাকে তো সে তুমি।

হেসে ললিতা বললে, কেন ?

—হ্যাঁ। তারাপদদা' চলে যাওয়ায় সকলের দুঃখ হয়েছে, হয়নি কেবল তোমার।

—দুঃখ ক'রে কি, করব বল ? কুটুম মানুষ—এসেছিল, আবার চ'লে গেছে। বারো মাস এখানে থাকতে তো পারে না।

—তাই বলছিলাম। আমাদের পড়াশুনো, খেলাধুলো বন্ধ। বড়বৌএর ঢেঁকি বন্ধ, রান্নাবাড়াও প্রায় তাই। এমনকি বাবাজি পর্যন্ত

একবার ক'রে জিগ্যেস করে চিঠি আসেনি? কেবল তুমিই দেখছি নির্বিকার। একদিন একটিবার নাম পর্যন্ত করলে না গো?

ললিতা হেসে বললে, সবাই মিলে নাম-সঙ্কীর্তন করতে হবে নাকি?

—তবু কেউ এলে-গেলে নাম কি করে না?

—তোমরা নাম করছ, আমি শুনছি। এই বা মন্দ কি?

একটু পরে আবার বললে, আমার মায়া-মমতা বড্ড কম, না রাধারানী?

—তাই দেখছি। ভাবছি, আমরা চ'লে গেলেও তো এমনি ভুলে যাবে। একবার নামও করবে না?

ললিতা লহরে লহরে হেসে উঠল। বললে, সেই বোঝ। বুঝে আমার সঙ্গে মেলামেশা ক'র।

রাধিকা সুদামের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে বিষণ্ণভাবে বললে, তাই বুঝছি। তোমার সঙ্গে এত মেলামেশা করা ভালো হয়নি।

—কেন? চ'লে গিয়ে মন-অসুক করবে নাকি?

—তা করবে বৈ কি!

রসময়ের দিকে একটা কটাক্ষ হেনে ললিতা বললে, শুনছ গো? শোন ভালো ক'রে।

রসময় চুপ ক'রে এক দিকে ব'সে ছিল। বললে, শুনছি।

—ভয় হচ্ছে নাকি?

—না।

ললিতা সবিস্ময়ে বললে, বল কি গো!

রসময় নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দিলে, হ্যাঁ।.. ওটুকু মন-অসুখ রাধারানীর বিয়ে হ'লেই সেরে যাবে।

উত্তর শুনে সুদাম এবং ললিতা দু'জনেই হেসে উঠল।

লজ্জা পেয়ে রাধিকা বললে, ধ্যেৎ! বাবাজির যত ইয়ে!

বিনোদিনী রান্নাঘরে কি যেন করছিল। এ কথা শুনতে শুনতে তার কি মনে হ'ল কে জানে, বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, আমার জন্যে মন-অসুখ করবে না ?

রাধিকা যে লজ্জা পেয়েছে, আর স্বীকার করে! মাথা নেড়ে স্বচ্ছন্দে বললে, না।

—মিথ্যে ব'ল না রাধারানী। একটু করবে।

—একটুও না।

—সুদাম সখার ?

উত্তর দেবার জন্যে সুদাম সখা মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বসল। বললে, আমার কথা যদি বল বড়বৌ, আমার করবে। একটা কুকুরছানা হারিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি দু'দিন খেতে পারিনি।

বিনোদিনী হেসে বললে, তবেই হয়েছে! আমাকে কি শেষকালে কুকুরছানার সামিল করলে ?

দ'মে গিয়ে সুদাম বললে, কথার কথা বলছি।

রসময় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ের পরেও এই মন-অসুখ থাকবে তো ?

বিস্ফারিত চোখে সুদাম বললে, নিশ্চয়।

—তাহ'লে ভালো বটে।

রসময় নিশ্চিন্তভাবে গাছে ঠেস দিয়ে বসল। এই রসিকতায় বিনোদিনীর জোরে হাসতে লজ্জা করল। হাসি গোপন করবার জন্যে সে রান্নাঘরের আশ্রয় নিলে।

ললিতা হেসে বললে, তবে যে আমার দোষ দিচ্ছিলে রাধারানী ? তোমার মনও তো কম শক্ত নয়।

রাধিকা গম্ভীরভাবে বললে, আমি বেটাছেলে, আমার মন শক্ত হবে না ? তাই ব'লে তোমাদের মনও শক্ত হবে ?

ললিতা চেঁচিয়ে বললে, ও বিনোদিনী, রাধারানীর কথা শোন্। ও নাকি বেটাছেলে, আর আমরা মেয়েমানুষ। শুনেছিস ?

বিনোদিনী রান্নাঘরে থেকে সাড়া দিলে, শুনেছি।

—যা ভেবেছি তাই। রাধারানীকে যতটা ছেলেমানুষ মনে করিস ততটা নয়। ভেতরে ভেতরে ওর জ্ঞান হয়েছে।

বিব্রতভাবে রাধিকা বললে, এ আর জ্ঞানের কথা কি! তোমরা মেয়েমানুষ, এ তো সবাই জানে।

মুখ ফিরিয়ে হাস্যগোপন ক'রে ললিতা বললে, তুমিও জান?

—তা আর জানব না?

—তাই জিগ্যেস করছিলাম।

সুদাম কিন্তু এতক্ষণ ধ'রে অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল। এদের কথা তার কানে যায়নি। হঠাৎ সে রাধিকার দিকে চেয়ে বললে, তারাপদদা'র সেই জুতো জোড়ার নাম কি বললে রে?

—গ্রিশ্যান।

—হুঁ।—সুদাম আবার চিন্তায় নিমগ্ন হ'ল।

বিনোদিনী রান্নাঘর থেকে বললে, জুতোর নাম জেনে কি করবে সুদাম সখা? আনতে হবে, নাকি?

—হুঁ।

বিনোদিনী হেসে বললে, শুধু ওই রকম জুতো পরলেই তো হবে না, ওই রকম কলেজে পড়তেও হবে।

সুদাম অন্যমনস্কভাবে ব'সে রইল। উত্তর দিলে না।

রসময় হেসে উত্তর দিলে, একসঙ্গে অত চাপালে হবে না বিনোদিদি। এবারে ওই জুতোর ওপর দিয়েই যা হয় হোক। আসছে জন্মে আবার দেখা যাবে, নাকি বল সুদাম সখা?

সুদাম সখা তখনও পর্যন্ত গ্রিশ্যান জুতোর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। অন্যমনস্কভাবে বললে, হুঁ!

বিনোদিনী আর রাধিকা জোরে জোরে হেসে উঠল।

সুদাম বিরক্তভাবে বললে, তার আর হাসি কি! এই ছোঁড়ার নাকে একদিন মারব এমন ঘুঁসি যে কেঁদে পার পাবে না।

রাধিকা আরও জোরে হেসে উঠল।

সুদাম বললে, হাস না কেন, হেসে নে। তারপর ওই রকম জুতো প'রে তোর নাকের উপর দিয়ে মশমশ ক'রে যেদিন যাব সেদিন বুঝবি। —ব'লে নিজেও হেসে উঠল।

রসময় বললে, সুদাম সখা, গান শিখে বৈষ্ণব হবে বলেছিলে যে!

চিন্তিতভাবে সুদাম উত্তর দিলে, বৈষ্ণব হ'তে আর তো কোনো অসুবিধে নেই, কেবল ওই আলখাল্লাটা বাপু পরতে পারব না।

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও।

সেইদিন ত্বপুরের ডাকে তারাপদর চিঠি এল। একসঙ্গে ত্ব'খানা। একখানা রসময়ের নামে, একখানা বোর্ডিংএ সুদামের নামে। রসময়ের খানা খামে। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিনোদিনী কিংবা ললিতা কেউই লিখতে পড়তে জানে না। সুতরাং তারাপদর পত্রের গোপনীয়তা নষ্ট হবার কোনো আশঙ্কা ছিল না। তবু সাবধানের বিনাশ নেই, তারাপদ বোধ হয় সেই নীতি অনুসরণ করেছে। তাছাড়া লেখার কথাও অনেক।

লিখেছে: বিনোদিনীর বাপের বাড়ি সে গিয়েছিল। হাবল এবং মেনী যত্নেই আছে এবং ভালো আছে। হাবল তারাপদকে চিনতে পেরেছিল, মেনী পারেনি। পারবার কথাও নয়। কতটুকুই বা মেয়ে! প্রয়োজনের খাতিরে সে রাত্রিটা থাকবার ফলে সকল কথা সে ধীরে ধীরে এবং গুছিয়ে বলার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ফল যে কি হবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। বিনোদিনীর মা কথাটা শোনার পর থেকেই অবিশ্রাম কাঁদছে। তারাপদকে দেখামাত্রই তো বিনোদিনীর মৃত্যুর জন্যে একচোট খুব কাঁদলে। তারপর আবার যখন শুনলে, বিনোদিনী মরেনি, বেঁচেই আছে, তখন আর একচোট কাঁদলে। কিন্তু শক্ত দেখা গেল বিনোদিনীর দাদাকে। বিনোদিনীর দাদা বটে। ওদের ভাই-বোনকে বিধাতা বোধ হয় পৃথক ধাতুতে গড়েছেন। ভাঙবে, তবু মচকাবে না। সমস্ত শুনে সে বললে,

তোমাকে বলিনি মা, কিন্তু প্রথম থেকেই আমার নিজের মনে এমনি একটা সন্দেহ হয়েছিল। তুমি কষ্ট পাবে ব'লে বলিনি। ছেলেপুলের মা, ডুবে মরলেই হ'ল? তাহ'লে আর কোথাও না কোথাও লাস পাওয়া যেত না?

তারপর লিখেছে: সব চেয়ে আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, বিনোদিনীর মা বিনোদিনীকে আনতে রাজী হলেও মেয়ের উপর তার সন্দেহ কিন্তু অনাত্মীয় আর পাঁচজনের চেয়ে কম নয়। আর সে সন্দেহ আমি সমস্ত কথা ভেঙে বলার পরেও এবং বহু প্রকার দিব্য করার পরেও এক তিল কম্‌ল না। মা হয়ে নিজের পেটের মেয়েকে সে চেনে না এই দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। তবে আর পরের দোষ দিই কি ক'রে? আমার মনে হ'ল, কলঙ্ক জিনিসটাই এমনি যে, অত্যন্ত তুচ্ছ এবং বিখ্যাত মিথ্যাবাদী একজন লোকও যদি সাবিত্রীর মতো সতীর নামেও কলঙ্ক দেয়, লোকে অবলীলায় তা বিশ্বাস করবে। আর সেই সঙ্গে তার নিজের বাড়ির লোকও। চরিত্রহানি জিনিসটা কি এতই সহজ এবং স্বাভাবিক যে, বিশ্বাস করবার জন্যে প্রমাণ চাইবারও আবশ্যক করে না? কি জানি!

এই জায়গাটা পড়তে পড়তে ওর উচ্ছ্বাসের বাহুল্য দেখে রসময় আপন মনেই হাসলে। তারপর পড়তে লাগল:

কিন্তু তবু সে মা। কোলের মেয়ের উপর স্নেহ আছে, মমতা আছে। বড়বৌএর মতো দুশ্চরিত্রা মেয়েকেও অবশেষে সে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিতে রাজী হ'ল। কিন্তু ওর দাদাকে এত মিনতি করেও কিছুতে নোয়াতে পারলাম না। সেই যে গোড়াতেই বলেছিল, বিনোদিনী মারা গেছে, তার আর নড় চড় হ'ল না। শেষ পর্যন্ত সেই কথাই বলবৎ রইল। হাত জোড় ক'রে বললে, তার কথা আর বলবেন না। আমার বোন মারাই গেছে। ছেলেমেয়ে দু'টো আছে, তাদের মানুষ ক'রে দোব, ব্যস। আমার ছুটি। আমার কাতর মিনতি, বৃদ্ধা মায়ের চোখের জল, কিছুতেই কোনো ফল হ'ল না।

এইখানে সে চিঠি শেষ করেছে। কিন্তু মাথার দিকে আবার একটা পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে :

ভালো কথা! স্টেশনে আসবার পথে হঠাৎ ললিতার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কি যেন তার নামটি ভুলে যাচ্ছি। তাকেও সব কথা বললাম। শুনে যেন সে আকাশ থেকে পড়ল। এ সংবাদে যেন বেশ মুষড়ে গেল। কিন্তু ভালো-মন্দ কোনো কথাই বললে না! আমাকে একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত না ক'রে নিঃশব্দে গ্রামের দিকে চ'লে গেল! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু লোকটির মাথা খুব সুস্থ ব'লে মনে হ'ল না।

রসময় আর একবার হাসলে।

বিনোদিনী অনেকক্ষণ থেকেই গভীর ঔৎসুক্যে ওর মুখের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, কি হ'ল?

—হয়নি কিছুই।

—তবে হাসছ যে?

—এমনিই।—তারপর বললে, লিখেছে বড়বৌএর ঢেঁকির গান শোনা হয়নি, এবার গিয়ে শুনব।

সলজ্জ হেসে বিনোদিনী বললে, আহা!

আবার জিজ্ঞাসা করলে, পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো? ভালোয় ভালোয় পৌঁছেছে?

—হ্যাঁ।—রসময় গড়গড় ক'রে ব'লে গেল, কোনো কষ্টই হয়নি। নির্বিঘ্নে পৌঁছেছে। তোমাদের জন্যে মন-অসুখ করছে। তোমাকে শত কোটি প্রণাম জানিয়েছে। আর লিখেছে, যদি কিছু দোষ ত্রুটি ক'রে থাকে, যেন ক্ষমা কর।

আনন্দ যেন বিনোদিনীর চোখ থেকে ঠিকরে বের হচ্ছিল। বললে, ও বাবা! দোষ ত্রুটি তো কত! বরং আমরাই কি খাইয়েছি, কি না। ভিখিরী বড়বৌ, খাওয়াবেই বা কি!

বিনোদিনী আঁচলে চোখ মুছলে।

এমন সময় হন্তদন্তভাবে সদলবলে সুদাম এসে উপস্থিত। তার ডান হাতে একখানা পোস্টকার্ড জয়পতাকার মতো ঘনঘন আন্দোলিত হচ্ছে। উৎসাহে তাদের মুখ চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এসেই চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের চিঠিও এসেছে নাকি বাবাজি?

—এসেছে!

—আমাদেরও এসেছে। আমার নামে। তবে সবারই কথা লিখেছে। শোন:

সুদাম 'প্রীতিভাজনেষু' থেকে 'ইতি, তোমাদের' পর্যন্ত এক নিশ্বাসে গড়গড় ক'রে প'ড়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করলে, শুনলে তো? তিনি কোথায়? ললিতাসখি?

—এই তো এখানে ছিল। বোধ হয় ঘাটের দিকে গেল।

সুদাম আবার চেঁচিয়ে বললে, পুজোর ছুটিতে আসবে লিখেছে যে!

কুন্ঠিতভাবে রাধিকা বললে, কিন্তু তখন আমাদের ছুটি নয়?

—সাতই অঘ্রান আবার ছুটি কিসের? চৌঠা তো আমাদের ইস্কুল খুলে যাবে।

—তাই বটে। আমি ভাবছিলাম।

নাক সিটকে সুদাম বললে, তোমার যে ওই রকমই বুদ্ধি! লিখেছে পষ্ট···সাতই অঘ্রান···

সুদাম আবার একবার চিঠিখানার আদ্যোপান্ত জোরে জোরে পড়লে।

—শুনলি তো?

—হুঁ। কিন্তু সামনেই পরীক্ষা। তখন আর গেলবারকার মতো এমন জমবে না।

মুখ বিকৃত ক'রে সুদাম বললে, না, জমবে না! সম্বৎসর ধ'রে পড়লাম তাতে কিছু হ'ল না, ওই তিনদিনেই যত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, না?

ললিতা কোথায় গিয়েছিল, এতক্ষণে ফিরল। বললে, তা তোমার না হয় মহাভারত অশুদ্ধ হবার ভয় নেই। ও বেচারা গরীবের ছেলে, ওকে তো পাস করতে হবে।

বিরক্তভাবে সুদাম বললে, ওকে পাস করতে নিষেধ করছে কে? যা রে যা, তুই পড়গে। আমি খারাপ ছেলে, আমার সঙ্গে মিশিস না। তারাপদদা' যখন আসবে তুই ঘরে খিল দিয়ে পড়া মুখস্থ করিস! আমি যখন ডাকতে যাব আমার কান ম'লে দিস। হয়েছে তো?

বিনোদিনী মুখ টিপে হেসে বললে, হয়েছে। আর দরকার নেই।

সুদাম বললে, হুঁ। তখন আসিস ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে।

বিনোদিনী বললে, হুঁ। তখন মজা দেখিয়ে দেবে।

ললিতা বললে, দেখিও। পরীক্ষার পরে রাধারানীও তোমাকে আর এক মজা দেখিয়ে দেবে। কি বল রাধারানী?

রাধিকা হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে বটে, কিন্তু তেমন যেন জোর পেলে না। অর্থাৎ পরীক্ষায় পাস করা ভালো, না তারাপদর সঙ্গ-সুখ প্রিয়, সে বিষয়ে এখনও সে মনঃস্থির করতে পারেনি।

সন্ধ্যার আগে বিনোদিনী ঘাটে গেলে ললিতা রসময়কে জিজ্ঞাসা করলে, কি লিখেছে চিঠিতে?

রসময় সমস্ত চিঠিটা আগাগোড়া প'ড়ে শোনালে। বললে, কি বুঝছ?

ললিতা চিন্তিত মুখে চুপ ক'রে রইল।

একটু পরে ললিতা বললে, আমারও এই ভয় ছিল।

—কেন?

—ওর দাদাকে তো চিনি। কাঠ গোঁয়ার। বৌটাকে মেরে মেরে আধমরা করে। তবে মা-মাগী ভালো।

—সে তো খুব কান্নাকাটি করছে লিখেছে।

হ্যাঁ। মন করলে নিয়ে যেতেও পারে। মায়ের ওপর ছেলের ভক্তি-ছেদ্দা আছে। কিন্তু দেখ, সোয়ামী যদি বৌ নেয় তো লোকের

বলবার কিছু থাকে না। কিন্তু বাপের বাড়ি গিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করবে কি ক'রে? সবাই জানে ও ম'রে গেছে।

রসময় একটু চিন্তা ক'রে বললে, আমরা যদি সাক্ষী দিই?

ললিতা হেসে ফেললে। বললে, ভালো লোক সাক্ষী! লোকে বলবে চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

—কেন আমি আবার গাঁটকাটা হলাম কি ক'রে?

—মনে বুঝে দেখ।

ললিতার কথার অর্থ হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম ক'রে রসময় বললে, ও! তোমার ব্যাপারে! তাই বল।

—গাঁটকাটা নয়? —ললিতা একটা কটাক্ষ হানলে।

—বটে। আমার সাক্ষী চলবে না।

একটু পরে বললে, আশ্চর্য দেখ, ওর মায়ের নিজেরই ধারণা বিনোদিদি ভালো নয়।

—যে শুনবে সেই তাই বলবে।

—তাই তো বলছি গো।

দু'জনেই চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। তারাপদর চিঠিতে ওরা কেউই বিশেষ আশা পেলে না। কান্নাকাটি ক'রে ওর মায়ের পক্ষে ছেলেকে রাজি করান সম্ভব হবে কি না তাই বা কে বলতে পারে? যা কাঠ-গোঁয়ার ওর দাদা। আবার নিতে এলেই বিনোদিনী যে গাড়ীতে উঠবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। জেদী সেও কম নয়। গৃহস্থ পরিবারে আর পাঁচটি মেয়ের মধ্যে মুখ নামিয়ে থাকতে হবে, সেই ভয়েই না সে এত আত্মীয়-স্বজন থাকতে এখানে এসে উঠেছে।

হঠাৎ ললিতা বললে, এক কাজ করুক বরং।

—কি কাজ?

—বৈষ্ণব হয়ে গিয়ে ও বরং দাদার সঙ্গে মালাবদল করুক। এইখানে একটা আখড়া বানিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করুক।

রসময় হেসে বললে, হ্যাঁ। ওর সুখ হোক না হোক তোমার দাদার তো একটা হিল্লে হয়ে যাক, কি বল ?

—কেন ওরই বা সুখ হবে না কেন ?

—আরে বিনোদিদি কি বৈষ্ণব হবার লোক ? ও হাড়ে হাড়ে গৃহী। ও ধান ভানবে, না মালা জপবে ?

ললিতা বললে, তবে ও ধান ভেনেই মরুক।

—তা না হয় মরল, কিন্তু তোমার দাদার গতি কি হবে ?

কোপ কটাক্ষ হেনে ললিতা বললে, আহা! আমার দাদার কি মেয়ের অভাব নাকি ? ও যে ছেলেবেলা থেকে বিনোদিনীকে কি চোখে দেখেছে, আর সংসারই করলে না! নইলে ওর আবার ···

বাধা দিয়ে রসময় বললে, ওইটি বাপু তোমার বাড়িয়ে বলা হ'ল। তারাপদ তোমার দাদার সম্বন্ধে কি লিখেছে শুনলে তো ? মনে হ'ল, মাথা খ'ব সুস্থ নয়।

ললিতা হেসে ফেললে। বললে, তা বলবে বৈ কি! তার নিজের মাথার খুব ঠিক তো ? যেমন তুমি, তেমনি তোমার তারাপদ।

রসময় সবিস্ময়ে বললে, আমি আবার কি করলাম ?

—তুমিও কম যাও না।

ললিতা কৃত্রিম ক্রোধে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

রসময় হেসে ডাকলে, শোন, শোন।

কিন্তু ললিতা আর ফিরলে না। রসময় আপন মনে হাসতে হাসতে গুনগুন ক'রে গান গাইতে লাগল।

নয় ।।

পুজোর আর দেরি বেশী নেই।

মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয়টা দিন। ভোরের সোনালী আলো মানুষকে কাজ ভোলাতে লেগেছে। কাজে কারও আর মন বসে না। নিত্যকার গৃহকর্মে সকলেরই যেন মন্থরতা এসেছে। পূজা না এলে আর কিছু ভালো লাগে না। ছেলেদের স্কুল এখনও বন্ধ হয়নি। কিন্তু পড়াশুনা প্রায় বন্ধই আছে। ক্লাসে ছেলেরা কিছুক্ষণ হো হো ক'রে চ'লে আসে। বোর্ডিঙের ছেলেরা বই যা-কিছু বাক্সে বন্ধ করেছে। তাদের বাড়ি যাওয়ার বাঁধা-ছাঁদা সম্পূর্ণ। শুধু বিছানা আর মশারি বেঁধে ফেললেই হ'ল। যারা ছোট, তারা ইতিমধ্যেই মাস্টারের কাছে কান্নাকাটি ক'রে ছুটি নিয়ে সরে পড়েছে। বোর্ডিঙে কেবল বড়রাই আছে। পড়া বন্ধ থাকাতে তাদের উপদ্রব বেড়েছে। চীৎকারে, কলহে তারা বোর্ডিঙ সরগরম ক'রে রেখেছে।

আউশ ধান কাটা সারা। আমন ধানে মধ্যে একটু জলের টান পড়েছিল। পুকুর থেকে জল তুলে জমিতে দেওয়াও হয়ে গেছে। লঘু ধান ফুলিয়েছে, চালও বেঁধেছে। তার আর করবার কিছু নেই। পুজোর পরে দু'টো চাষ দিয়ে আউশের জমিতে আলু, কিংবা কৃষ্ণ মুগ, মুসুরি যা-কিছু একটা লাগালেই চলবে। ইতিমধ্যে তাদের হাতে আর বিশেষ কিছু কাজ নেই।

মেয়েদের ঘর-দোর পরিষ্কার করার কাজ শেষ। বাড়ি-ঘর নিকানো, দরজায় আলকাতরা দেওয়া, কারও বা বৈঠকখানা এলামাটি দিয়ে রঙ

করা, যাদের ঘরে নানাবর্ণের মাটির কাজ আছে তাদের সেসব রঙ করা অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের কাপড় রঙ করাও সম্পূর্ণ। এখন পুজোর জন্যে কেউ ভাজছে মুড়ি, কেউ খই, কেউ বেশনের ঝুরি। নাড়ু হবে। বিজয়ার দিন লোকে যখন বাড়ি বাড়ি সম্ভাষণ জানাতে আসবে তখন হাতে হাতে মিষ্টি কিছু দিতে হবে তো! কারও কারও বাড়িতে নারকেলের নাড়ুও তৈরি করতে লেগে গেছে। এখন সন্ধ্যার পরে ঘরে ঘরে গুড়ের ভিয়ান চড়েছে। আর তারই চমৎকার গন্ধে পাড়া মৌ মৌ করছে। আসন্ন পুজোর আনন্দে গ্রামখানি এখন থেকেই জম-জমাট হয়ে উঠেছে।

এ ক'টা বৎসর অজন্মায় মানুষ আর হাসেনি। অনেকদিন পরে এবার দেখা গেল তারা হাসছে, গল্প করছে, অনেক রাত্রি পর্যন্ত আবার লোকের বৈঠকখানার দাওয়ায় দাওয়ায় চলছে তাস-পাশা-দাবার আড্ডা। কোথাও আবার রামায়ণ-মহাভারত পাঠ আরম্ভ হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত অকারণে পথে পথে ছুটোছুটি করছে। কোথাও পরমোৎসাহে চলেছে গান-বাজনার ধুম! যারা এখনও ততটা সাবালক হয়নি, তারা এখানে ওখানে অন্ধকারে ব'সে নিরিবিলি বাঁশী বাজাচ্ছে। কেবল যারা কাজের লোক, তারাই বিব্রত হয়ে উঠেছে। অকস্মাৎ সমস্ত কাজ থেকে ছুটি পেয়ে কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না।

আউশ ওঠামাত্র ধানের দর নেমে গেছে। অথচ চাষীদের সকলেরই পুজোর খরচ চালাবার জন্যে কিছু কিছু ধান বিক্রি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এইটে তারা চিরকাল থেকে দেখে আসছে যে, যতদিন তাদের গোলায় ধান থাকে ততদিন ধানের দরও কম থাকে। তাদের গোলা খালি হলেই দর বাড়ে। এই এতদিন বেশ দর ছিল। যেই দু'টি ধান হ'ল অমনি দরও গেল নেমে। শুধু তাই নয়, ক্রেতাও গেল উড়ে। হকের ধান বিক্রি করতে হবে সাধাসাধি ক'রে। এমনই অদৃষ্ট! গৃহিণীর সঙ্গে রোজ কলহ বাধে

পুজোর কাপড়-চোপড় নিয়ে। কিন্তু এমনি পুজোর হাওয়ার গুণ, কোনো চিন্তাই যেন মাথার মধ্যে স্থায়ীভাবে টিঁকতে দেয় না। ঝ'ড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতা যেমন ক'রে উড়ে যায়, তেমনি ক'রে দুশ্চিন্তাও যাচ্ছে উড়ে।

মানুষ যেন কেমন বেপরোয়া হয়ে গেছে। ছেলেপুলের মুখের ধান, তাই বিক্রি ক'রে দিচ্ছে পরমোৎসাহে। কেউ বা গৃহিণীর গহনা বন্ধক দিয়ে, কেউ বা বাড়ি-ঘর বন্ধক দিয়ে স্ফূর্তির সঙ্গে করছে ধার। কি ক'রে যে শোধ দেবে সে চিন্তা একবার মনেও আনছে না। অবশেষে অনেক গৃহস্থেরই গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া মিটমাট হয়ে গেল। যে যেমন কাপড়-জামা চেয়েছিল, সে তেমনটিই পেয়ে যেতে লাগল। আবার মেঘাচ্ছন্ন মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটতে লাগল। যে গৃহিণীর সাধ মিটল না, অবশেষে তারও মুখে হাসি ফুটল। সাদা-মাটা যা পেলে তাই শেষ পর্যন্ত আদর ক'রে মাথায় তুলে নিলে। পূজা তো আর এক বৎসরেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আবার আসছে বৎসর তো আছে। তখন সাধ মেটালেই হবে। সত্যিই তো, স্ত্রীপুত্রের রঙিন কাপড়ের জন্যে মানুষ তো আর চুরি করতে পারে না। যার যেমন অবস্থা, তার তেমনি চলতে হবে। এবার যা হয়েছে তাই বেশ হয়েছে। আসছে বার মা দুর্গা যদি মুখ তুলে চান তখন সব হবে।

উৎসাহ থাকলেও ধুমধামটা ললিতাদের বাড়িতে অনেকটা কম। ধুমধাম ছেলেপুলেদের নিয়ে। তা এ বাড়িতে ছেলেমেয়েরই অভাব। সুদামের দল থাকে বোর্ডিঙে। এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে বটে, কিন্তু তারাও কেমন যেন মিইয়ে গেছে। সকলেরই মন বাড়ির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এ ক'টা দিন কিছুই তাদের ভালো লাগছে না। এখানে তারা আসে যায়, তামাক খায়, কিন্তু সে হৈ চৈ আর নেই। এমনকি তারাপদর প্রসঙ্গেও কারও যেন আর তেমন আগ্রহ নেই।

সেদিন রসময় নেই বাড়িতে। দূর গাঁয়ে কোথায় বেরিয়েছে ভিক্ষায়। ফিরতে সন্ধ্যা হ'তে পারে। বিনোদিনী তো এমনিতেই

প্রত্যহ রাঁধে না। ললিতারও রাঁধবার ইচ্ছা নেই। রাত্রের পান্তা ভাত আছে, কলাইগুঁড়ো দিয়ে তাইতেই এ বেলাটা চ'লে যাবে। সুতরাং একলা নিজের জন্যে অত ঝঞ্চাট আর পোয়াতে ইচ্ছা হ'ল না। স্নানাহ্নিক সেরে দু'জনে দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

বেলা বেশী হয়নি। কিন্তু কেমন একটা চিড়বিড়ে রোদ। গায়ে লাগলে গা জ্বালা করে। এর মধ্যে তকতকে ক'রে নিকানো মাটির দাওয়ার স্পর্শ বড় মিঠে ঠেকছে। তার সঙ্গে নিমগাছের ঝিরঝিরে হাওয়া অঙ্গ যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। গ্রামের ভিতরে যদি বা কোনো শব্দ থাকে এত দূরে এসে তা পৌঁছচ্ছে না। কেবল অনতিদূরে কোথায় একটা ঘুঘু একটানা সুরে ডেকে যাচ্ছিল। সে ডাকে মানুষের চিত্ত না-পাওয়া কোনো বস্তুর জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ওরা নিঃশব্দে দু'জনে শুয়ে আছে। বেলা ক্রমে দুপুর পেরিয়ে বিকেলের দিকে ঢ'লে পড়ল। হঠাৎ ললিতা ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। পাশে চেয়ে দেখে বিনোদিনী তখনও তেমনি ক'রে শুয়ে আছে। বোধ হয় ঘুমিয়েই গেছে। ওর মুখ পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা।

ললিতা ঠেলা দিয়ে ডাকলে, ও বিনোদিনী, ওঠ। বেলা গেছে। খেতে হবে না?

হঠাৎ ওর মনে হ'ল বিনোদিনীর সমস্ত দেহ থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে, যেন চাপা কান্নার ভারে। তাড়াতাড়ি ওর মুখ খুলে দেখে, সত্যিই তাই। বিনোদিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে। অশ্রুজলে মেঝে গেছে ভিজে।

—ও আবার কি! ভরদুপুর বেলায় আবার কাঁদতে বসলি কেন? কি, হ'ল কি?

ললিতার কথায় ওর কান্না যেন আরও বাড়তে লাগল।

—ঢঙ। নে ওঠ, খাবি চল।

বিনোদিনী আরও একটু চুপ ক'রে প'ড়ে থেকে অবশেষে উঠল।

নিজের নিজের হেঁসেল থেকে ভাত বেড়ে দু'জনে পাশাপাশি খেতে বসল। বিনোদিনীকে ললিতা চেনে। তার কান্না সম্বন্ধে একটা কথাও সে তুললে না। সে জানে আসন্ন পুজোর মুখে মাতৃহৃদয় কিসের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আহা! এসে পর্যন্ত বেচারী একটি দিনও কাঁদেনি। বুকের ভিতরটা ওর দিবারাত্রি আথাল-পাথাল করছে, কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জল নেই। একটুখানি নিরিবিলি ওর কাঁদা প্রয়োজন।

আহারান্তে বিনোদিনী ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ললিতা তাকে একা ছেড়ে দিলে। শুয়ে শুয়ে নির্জনে প্রাণ খুলে ও একটু কাঁদুক। রসময়ের সেই বহির্বাসটায় সামান্য কিছু শেলাই এখনও বাকি। ললিতা দাওয়ায় ব'সে ব'সে আপন মনে শেলাই করতে লাগল। শেলাইয়ে রসময় সিদ্ধহস্ত। তার আবার অন্যের হাতের শেলাই পছন্দ হয় না। কিন্তু ললিতাই বা এই বিকেল বেলাটা একা করে কি? তারও তো একটা কাজ চাই।

এক দল চড়ুই পাখী ধানের সন্ধানে ঢেঁকিশালে কিচকিচ করছে। একটা কাঠবেরালি উঠান পর্যন্ত নেমে কি যেন সন্ধান করছে, আর কোথাও ঠুক ক'রে এতটুকু শব্দ হ'লেই ছুটে গিয়ে নিমগাছে উঠছে। কাঠবেরালি শশকের মতো ভীরু এবং সতর্ক। শশকের মতোই নিরীহ। ললিতা ওর জন্যে চাল এনে উঠানে ছিটিয়ে দিলে।

সেই দিন বিকালে রসময় ফিরল। একা নয়, সঙ্গে ললিতার দাদা। ললিতা তখন পা ঝুলিয়ে ব'সে আছে। মাথার এলোচুল পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। আর বিনোদিনী একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখ লাল। বোধ হয় এইমাত্র ঘুমিয়ে উঠল। ললিতার শেলাই শেষ হয়ে গেছে।

—ভিক্ষে পাই গো।

এক সঙ্গে ললিতা এবং বিনোদিনী চমকে উঠল। গলার স্বর চিনতে ওদের কারও দেরি হয়নি। চোখের পলকে ললিতা মাথায় কাপড় দিতে দিতে ছুটে ঘরের ভিতর গিয়ে লুকোল। দাদাকে মুখ দেখাতে তার লজ্জা করছিল। বিনোদিনীরও ইচ্ছা হ'ল ছুটে পালায়। কিন্তু অকস্মাৎ গৌরহরির কণ্ঠস্বর শুনে তার দেহ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। পা গেল বেধে। বিনোদিনী খুঁটিটা শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

তখন দু'জনে হাসতে হাসতে মাঝ-উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কে গো, একটা বসবার জায়গা দাও দেখি।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর থেকে একটা মাদুর এনে দাওয়ায় পেতে দিলে।

—থাক থাক। আর বসব না। চারটি ভিক্ষে পেলেই বিদায় হ'তে পারি।

রসময় হেসে বললে, হরিনাম করলে না, কিছু না। ভিক্ষে চাইলেই ভিক্ষে পাওয়া যাবে? তুমি তো আচ্ছা বৈষ্ণব দেখছি!

—হরিনাম করিনি নাকি? —গৌরহরি বললে।

—কখন করলে? ওই তো একজন দাঁড়িয়ে আছে, ওকেই জিগ্যেস করতে পার। বিনোদিদি, কি বল?

বিনোদিনী উত্তরে শুধু একটু মুচকি হাসলে।

একটু একটু ক'রে আড়ষ্টভাব কাটলে জিজ্ঞাসা করলে, মানিক-জোড়ের আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

—রাস্তা থেকে।

—দেখা হ'ল কোথায়?

—রাস্তায়।

—মন্দ নয়। —বিনোদিনী হেসে বললে, ব'স।

রসময় বললে, এরা সব গেল কোথায়? একটু পা ধোবার জলটল দিতে হ'ত যে।

গৌরহরিও বললে, তাই তো। ললিতা কোথায় গেল? তাকে দেখছি না যে!

ললিতা মাথায় কাপড় দিয়ে সঙ্কুচিতভাবে এসে দাদাকে প্রণাম করলে। তারপর পা ধোবার জায়গায় ছু'টি জলের ঘটি এনে রাখলে।

—পা ধোও হে! —রসময় বললে।

—হঁ্যা। যাই।

কতদিন পরে গৌরহরি ললিতাকে দেখল! আর এই ক'বছরে ওর কি পরিবর্তনই না হয়েছে। মাথায় হয়তো বাড়েনি, কিন্তু ঘোমটা দেওয়ায় আগের চেয়ে বেশী লম্বা দেখাচ্ছে। দেহ, হঁ্যা, দেহ খানিকটা শীর্ণই হয়েছে, কিন্তু আগের চেয়ে ঢের কমনীয়।

বললে, ভালো আছিস?

ঘাড় নেড়ে ললিতা জানালে, হঁ্যা।

তখনই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল। প্রথমে নিঃশব্দে, তারপরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, অবশেষে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে জোরে জোরে তার মৃতা জননীর উদ্দেশে।

গৌরহরির মনে পড়ল তাই বটে। মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-বোনে এই প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। সে কথা ওর স্মরণ ছিল না। এখন স্মরণ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আরও স্মরণ হ'ল মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় পাশাপাশি ছু'জনের বড় হওয়া। কত খেলা, কত ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। কত ভাব কত ঝগড়া, কত আদর কত অভিমান, কত হাসি কত কান্না। এমনি ক'রে মাতৃস্নেহধারা সিঞ্চনে ধীরে ধীরে তারা ছু'টিতে বড় হয়েছে। সেই ললিতার এতদিন যে কি ক'রে সে সংবাদ না নিয়ে ছিল তা তার নিজেরই আশ্চর্য মনে হ'ল! অপরাধ? হ'তে পারে ললিতা অপরাধ করেছে। কিন্তু সে তো ভাই বটে! ভাই হয়ে বোনের অপরাধ ক্ষমা করা কি এতই কঠিন!

গৌরহরির মন অনুশোচনায় ভ'রে উঠল।

কিন্তু সে একটা সান্ত্বনার কথাও কইতে পারলে না। হাত মুখ ধুয়ে এসে নতমুখে নিজের মাদুরটিতে ব'সে রইল। কাঁদতে কাঁদতে ললিতা অবশেষে শ্রান্ত হয়ে চুপ করলে।

রসময় দেখলে ভাই-বোনের মিলনের মধ্যে সে নিতান্তই অবাঞ্ছিত তৃতীয় পক্ষ। ধীরে ধীরে সে স'রে পড়ল। রইল কেবল বিনোদিনী। তৃতীয় পক্ষ হ'লেও রসময়ের মতো সে অবাঞ্ছিত নয়।

রসময় চ'লে যেতে ললিতা অনাবশ্যক বিবেচনায় মাথার ঘোমটা খুলে ফেললে। দাদাকে দেখে তারও বিস্ময় কম হয়নি। সে যে কোনোদিন তাদের আখড়ায় পা ছোঁয়াবে এ তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিস্ময় আরও বেশী হ'ল তাকে রসময়ের সঙ্গে দেখে। ছেলেবেলায় দু'জনের মধ্যে যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল, ললিতার অন্তর্ধানের পর সেই অন্তরঙ্গতা বিদ্বেষে পরিণত হ'ল। সেই দু'জনে যে কোনোদিন পাশাপাশি দাঁড়াবে, এ শুধু ললিতা কেন, ওরা নিজেরাও ভাবেনি।

গৌরহরি নিজে থেকেই বললে, বড় বাবাজির আখড়ায় দেখা। কেউ কি কাউকে চিনতে পারি? বড় বাবাজি নিজে পরিচয় করিয়ে দিতে তখন চিনলাম।

বড় বাবাজির নাম উচ্চারণ হওয়া মাত্র ললিতা এবং গৌরহরি উভয়েই মাথায় হাত ঠেকিয়ে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

ললিতার চোখের জল তখন শুকিয়ে এসেছে। গলা ঝেড়ে জিজ্ঞাসা করলে, বড় বাবাজি ভালো আছেন? কতদিন যে এদিকে আসেননি তার ঠিক নেই।

—আর কি তাঁর উঠে-হেঁটে বেড়ানর শক্তি আছে? বয়সও তো কম হ'ল না। তবে শুয়ে শুয়েই সকলেরই খবর নেন।

—কেমন দেখলে?

—বড় ভালো নয়। এবারে বোধ হয় দেহ রাখবেন।

—আহা! উনি গেলেই এ দিকটা অন্ধকার।

—তা আবার নয়! আমাদের সম্প্রদায়ের এখন তো মাথা বলতে উনিই। আর আছেন সুন্দরপুরের ছোট বাবাজি।

আবার উভয়ে যুক্তকর মাথায় ঠেকাল।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, কে দেখছেন?

—রাধারানী নিজেই দেখছেন। উনি কি আর মানুষের দেখার ভরসা করেন! কবিরাজ ডাকা হয়েছিল, উনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের চোখে জল দেখে বললেন, ভয় নেই রে, কাঁদিস না। মাঘী পূর্ণিমার আগে আমি যাচ্ছি না।

ললিতা চুপ ক'রে রইল।

গৌরহরি বললে, মহাপুরুষের বাক্যি। সে তো আর মিথ্যে হবে না। ওই দিনই উনি দেহ রাখবেন। একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়। আর কত দূর দূরান্তর থেকে কত লোক যে দর্শন করতে আসছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। —হেসে বললে, আবার ওরই মধ্যে কেউ এসেছে অম্বলের ওষুধ নিতে। কার মেয়ের সন্তান হয়নি তার জন্যে মাদুলি চাই। হাঁপানীতে, দেহ জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, তাই এসেছে কতদিনের পথ ভাঙতে ভাঙতে লাঠিতে ভর দিয়ে।

—ভালো হয়ও তো।

—হবে না? ওঁরা কি সামান্যি মানুষ নাকি? তবে বিশ্বাস ক'রে ভক্তিভরে খেতে হবে।

ললিতা বিনোদিনীর দিকে চেয়ে বললে, ওষুধ তো আর কিছু নয়, শুধু ধুলোপড়া। ব্যস।

গৌরহরি হেসে বললে, ও কি আর ধুলো রে পাগলী? ধুলোতে কি আর রোগ ভালো হয়? ও যে সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের রজ।

—হ্যাঁ।

গৌরহরি গলা নামিয়ে বললে, সত্যি সত্যি উনি তো আর পুরুষ নন। এদিকে বাইরে থেকে এত বড় দাড়ি, আর ইয়া গোঁফ বটে, কিন্তু আসলে উনি পুরুষ নন।

বিস্মিতভাবে বিনোদিনী বললে, তবে ?

মৃদু হেসে গৌরহরি বললে, উনি যে অষ্টসখীর একজন। উনি যে স্বয়ং বিশাখা।

শুনে বিনোদিনীও হাত জোড় করে প্রণাম জানালে।

গৌরহরি বললে, বড় বাবাজি একেবারেই শয্যে নিয়েছেন। আহার তো নেই বললেই হয়। সকালে সন্ধ্যেয় একটু ক'রে দুধ, আর তেষ্টা পেলে এক ফোঁটা করে চন্নামেত্য। ব্যস।

একটু পরে ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, বড় বাবাজির বয়স কত হবে ?

—কি ক'রে বলব ? আমরা তো চিরকাল ওঁকে অমনি দেখছি। যোগেশ পালের বয়স চারকুড়ি পার হ'ল। কিন্তু সেও কখনও ওঁর কাঁচা দাড়ি দেখেনি। তাই তো বলছে।

—বাবা !

—ওঁদের সব ইচ্ছেমৃত্যু, বুঝলি না ? ইচ্ছে করলে এখনও দু'শো বছর বাঁচতে পারেন, তবে ইচ্ছে হ'লে কালই দেহ রাখতে পারেন।

—তা আর নয় ! বলে ···

—এই কোজাগরী পূর্ণিমা থেকে কীর্তন আরম্ভ হবে, মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ। সব কীর্তনিয়ার কাছে চিঠি গেল। সবাই ওঁর শিষ্য কি না। খুশী হয়ে আসবে। আর আউল, বাউল, দরবেশের তো সীমা-সংখ্যা নেই। তারা এখন থেকেই জুটতে আরম্ভ করেছে। দিনরাত ভজন-গান চলেছে। আর সেই সঙ্গে মচ্ছব।

—ওই আখড়ায় আঁটছে কি ক'রে ?

—পাগল ! তাই কখনও আটে ? আখড়ার বাইরে প্রকাণ্ড বড় বড় দু'টো চালা তোলা হয়েছে। একটায় থাকে মেয়েরা, একটায় পুরুষ। রান্নার জায়গা, খাওয়ার জায়গা আলাদা।

এমন সময় রসময় ফিরে এল। বললে, কি হে ! হাত-মুখ ধোয়া হ'ল ? এইবার আমাদের দু'টি মুড়ি-টুড়ি দাও গো !

ললিতা মুড়ি আনতে ঘরের মধ্যে গেল। ফিসফিস ক'রে ব'লে গেল, ও মা! আমার তো মনেই ছিল না।

গৌরহরি বললে, সে কি হে! এই যে মচ্ছব মেরে এলে!

—তাই বটে! তারপর রাস্তা হেঁটে এসেছি কতখানি তার হিসেবটা একবার করা হোক।

—এরই মধ্যে ক্ষিদে লেগে গেল তোমার?

—লাগল বৈ কি! তোমার ক্ষিদে না লাগলে খেও না। বোনের সঙ্গে এন্তার গল্প কর না কেন। আমাকে দু'টি খেতে হবে। দাও গো কি আছে, মুড়ি, চিঁড়ে যা কিছু হোক। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

গৌরহরি হেসে বললে, এত!

—তা হবে না।

ললিতা জলহাত দিয়ে জায়গা পরিষ্কার ক'রে দু'জনকে খেতে দিলে। যাওয়ার সময় ঘোমটার ফাঁকে রসময়কে একটা হাসিভরা কোপকটাক্ষ হেনে গেল। উত্তরে রসময় শুধু একটুখানি হাসলে।

সন্ধ্যার পরে দাদার সামনে ললিতার আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত ভাব অনেকটা কেটে গেল। একটু একটু ক'রে তার পূর্ব বাচালতাও এল ফিরে। ললিতা রান্নাঘরের চাতালে রান্না চড়িয়েছে, অদূরে বিনোদিনী জড়ো-সড়ো হয়ে ব'সে, হুঁকোটা হাতে ক'রে গৌরহরি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল।

বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি রান্না চড়ালে না?

বিনোদিনী শুধু একটু হাসলে। জবাব দিলে না।

জবাব দিলে ললিতা। বললে, ও আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

মুখ নেড়ে বিনোদিনী বললে, মরণ আর কি!

চিন্তিতভাবে গৌরহরি বললে, তাইতো! তোমাদের গ্রামের ছেলেটির কাছে সব শুনলাম। তোমার মা তো দিনরাত্রি কাঁদছে।

ললিতা চোখ টিপে নিষেধ করলে। কিন্তু গৌরহরির সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি চলে না। হয়তো লক্ষ্যই করলে না, কিংবা বুঝতে পারলে না।

বিনোদিনী চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, মা কি করে জানলে?

ললিতা আবার চোখ টিপলে।

কিন্তু গৌরহরির কাছে চোখ টেপা মিথ্যা। বললে, সেই ছোকরা বলেছে, আমি যার কাছে শুনেছি।

—তার সঙ্গে কোথায় দেখা হল?

—আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিলে যে। সেই ছোকরাটি গো, ফিটফাট থাকে, কলেজে পড়ে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

বিনোদিনীর বুঝতে বাকি রইল না যে, তারাপদ এখান থেকে তাদের বাড়ি হয়ে শহরে গেছে। তারাপদর উপর ওর রাগ হ'ল। কি আবশ্যক ছিল তার অনধিকার চর্চা করবার। সত্যিই তো আর সে-কিছু তাদের আত্মীয় নয়। যাকে বলে ধান সম্পর্কে পোয়াল মেসো, তাই। এ সব বাড়াবাড়ি সত্যিই অসহ্য। রাগে বিনোদিনীর চোখ ফেটে জল আসবার মতো হল।

ললিতা তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ পাড়লে।

বললে, তুমি আখড়া তৈরি করেছ?

—কোথায় করব?

—কেন, গাঁয়েই।

গৌরহরি চুপ ক'রে রইল।

একটু পরে বললে, ভেবেছিলাম বিনোদিনীদের কমলপুরে ময়ূরাক্ষীর ধারে একটা আখড়া বানাব। সে কথা ওকে বলেওছিলাম। তা আর হ'ল কই?

বিনোদিনী ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, তাই বানাও না। ময়ূরাক্ষীর ধার তো ডুবে যায়নি।

উত্তরে গৌরহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ললিতা মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলে। কমলপুরে আখড়া তৈরি করার ইচ্ছা কেন যে দাদার আর নেই সে কথা বুঝতে তার বাকি রইল না। একটু পরে হাসি সংবরণ করে জিজ্ঞাসা করলে, কেন আমাদের গাঁ-ই বা মন্দ কি?

—অমন ময়ূরাক্ষীর ধার তো নেই।

—নাই বা রইল। আমাদের আখড়াটি তো মন্দ ছিল না। তার আর কিচ্ছু নেই?

—থাকবে না কেন? সেই নিমগাছটা আছে।

—আর ঘর-দোর?

—দেওয়ালগুলো আছে।

এমন নির্মমভাবে গৌরহরি কথাগুলো বললে যে, ললিতা ব্যথিত বিস্ময়ে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। নিজের গ্রাম, নিজের আখড়া, এর উপর ওর যেন বিন্দুমাত্র মমতা নেই। শুধু একটি স্ত্রীলোকের অভাবে। আরও ভালো ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়, বিনোদিনীর জন্যে। কি চোখে যে গৌরহরি ওকে দেখেছে, আর অন্য স্ত্রীলোকের দিকে এতকালের মধ্যে চাইতেই পারলে না। ঘর বাঁধলে না, বাঁধতে পারলে না। তবু যদি বিনোদিনী এখানে চ'লে না আসত, তাহ'লে হয়তো বা কমলপুরে ময়ূরাক্ষীর ধারে একটি আখড়া বাঁধতেও পারত।

ললিতা বললে, ময়ূরাক্ষী তো এখানেও আছে। এখানেই না হয় আখড়া বাঁধ।

গৌরহরি অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, এখানে কি জায়গা আছে? এখানে বরং···

ললিতা আঙুল দিয়ে আমবাগানের ও-পাশটা দেখিয়ে বললে, ও-জায়গাটা তো পড়েই আছে। জমিদাররা লোকও ভালো। বললে হয়তো দিতে পারে।

—তা তাই দেখ্ না। রসময়কে বরং একদিন বাবুদের কাছে পাঠিয়ে ব্যাপারটা জানতে পারিস। পাওয়া গেলে আমার কাছে সংবাদ পাঠালে···কিংবা এদিকে আমারও তো যাওয়া-আসা আছে, একদিন এসে খবরই নিয়ে যাব বরং।

ললিতার মুখ-চোখ খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রকাশ্যে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, তুমি থাক তো বলি। নয়তো মিছিমিছি।

—ওই তো বললাম। আবার কি ক'রে বলব!

কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরের বিরক্তি ললিতা যেন গায়েই মাখলে না। বললে, ও-রকম ক'রে বললে হবে না। তুমি সুস্থ হয়ে ভাব। ভেবে-চিন্তে যা স্থির করবে আমাকে ক্রমে জানাবে। তখন আমি বরং···

বিড়বিড় ক'রে গৌরহরি বললে, তখন আমি বরং···। তোর সঙ্গে কি আমি ইয়ার্কি করছি নাকি? বললাম, ও-জায়গাটা যদি হয় থাকব। আমি কি আর না ভেবে-চিন্তেই বলছি!

চোখ বড় বড় করে ললিতা বললে, তাহ'লে দেখ। আমরা চেষ্টা করব। তখন যদি বল থাকব না, তাহ'লে কিন্তু ভালো হ'তে পারবে না, ব'লে দিচ্ছি!

—না রে না। বললাম তো তোকে। —ব'লে বিনোদিনীর দিকে চাইলে।

বিনোদিনী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, মা কি বলছে?

সবিস্ময়ে গৌরহরি জিজ্ঞাসা করলে, কার মা?

—আমার মা?

নিশ্চিন্তভাবে গৌরহরি বলল, আর কিছু বলেনি।

ললিতার দিকে চেয়ে বললে, ওটা হ'লে একেবারে পাশাপাশি দু'টো আখড়া হয়। কি বলিস? মধ্যে কেবল ওই বেড়াটা। বেশ হবে। চমৎকার হবে।

ব'লে ওই দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন বেশ হবে তাই রসিয়ে রসিয়ে অনুমান করতে লাগল।

—এমনি একটা উঁচু দাওয়াওয়ালা দক্ষিণদ্বারী ঘর করতে হবে। কি বলিস? এই ক'টা আমগাছ পড়বে উঠানে। ওতে ক'টা মাধবী-লতা তুলে দোব। মাঝের আমগাছটির তলায় একটা বেদী বাঁধাব। কিন্তু তোদের নিমতলার মতো এত উঁচু ক'রে নয়। তাতে উঠানটা জবরজঙ্গল হবে। উঁচু করব কেবল তুলসীতলাটা। হাসছিস যে?

মুখ ফিরিয়ে ললিতা বললে, হাসিনি।

বিরক্তভাবে গৌরহরি বললে, হাসছিস, আবার বলছিস হাসিনি। আমার কি আর চোখ নেই?

ললিতা আর থাকতে পারলে না। একেবারে জোরে জোরে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীও।

গৌরহরি বললে, পাগল কি আর গাছে ফলে! হুঁ!

বিনোদিনী আর থাকতে পারলে না। বললে, তুমি যে গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল দিতে আরম্ভ করলে। আগে জমিটা পাওয়াই যাক, তার পরে না হয় ঘর তৈরি ক'র।

এতক্ষণে গৌরহরি ওদের হাসির অর্থ ধরতে পারলে। অপ্রস্তুত-ভাবে বললে, না, তাই বলছিলাম।

এমন সময় রসময়কে আসতে দেখে গৌরহরি লাফিয়ে উঠে বললে, এই যে, রসময় এসেছে।

হাত জোড় ক'রে রসময় বললে, হুকুম করুন।

—তোমার আমবাগানের ওই দিকটা আমাকে ব্যবস্থা ক'রে দাও না কেন?

—আখড়া করবে ?

—পেলে করি বৈ কি।

—সত্যি বলছ ? —উৎসাহে, উদ্দীপনায় রসময়ের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

—সত্যি বৈ কি !

একটু চিন্তা ক'রে রসময় বললে, তা পাওয়া যেতে পারে। ওটা তো পড়েই রয়েছে। তা গিন্নিমাকে বললে পরে···তাঁর যে প্রকার ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে ভক্তি, হয়তো···তা তুমি যদি থাক, আমি কালই গিন্নিমার কাছে গিয়ে তোমাকে জানাতে পারি।

—বেশ তো।

রসময় উৎসাহের সঙ্গে বললে, এই সময়। পুজোর পরে ত্রয়োদশীর দিন দেওয়াল দিতে আরম্ভ করলে ফাল্গুনের মধ্যে ঘর উঠে যাবে। এবারে যা ধানের অবস্থা, তোমার বাঁশ-খড় কিছুরই অভাব হবে না। যাকে চাইবে সেই দেবে। ভালোই হয়েছে।

ব'লে উৎসাহের আধিক্যে রসময় চকমক ক'রে সকলের দিকে চাইতে লাগল। হঠাৎ বললে, এখনি গেলে হয় না ?

ললিতা আড়চোখে বিনোদিনীর দিকে চেয়ে ফিক করে হাসলে।

বিনোদিনী ভ্রূভঙ্গি ক'রে বললে, তাই যাও। রাত তো বেশী হয়নি। গিন্নিমা তোমার জন্যে বার-দরজায় ব'সে আছেন।

দ'মে গিয়ে রসময় বললে, তবে থাক হে। কাল সকালেই যাওয়া যাবে। এখন চল, ও-ঘরে গিয়ে একটু তামাক খাওয়া যাক।

ওরা চ'লে যেতে ললিতা আর বিনোদিনী তো হেসে লুটোপুটি। দুই পাগলে ভালো মিল হয়েছে বটে। এইবার কে কার পাল্লায় পড়ে দেখা যাক।

বিনোদিনী বললে, এইবার আমার বাস উঠল ভাই।

ললিতা অত বুঝলে না। হেসে বললে, আমারও।

*　　*　　*

ও-ঘরের দাওয়ায় গৌরহরি বেশ জমিয়ে বসল। ওর নিরাসক্ত চোখে আবার আসক্তি উঠল ফুটে। বিরক্ত মনে আবার লাগল অনুরাগের ছোপ। আখড়া তৈরীর দিকে আবার মন ফিরে এল। আর এমন ক'রে এল যে, ওর মনে হচ্ছিল এই রাত্রেই যদি আখড়াটা তৈরি করা যায়, তাহ'লে আর কাল সকালের জন্যে দেরি করার প্রয়োজন নেই। উৎসাহ রসময়েরও কম নয়। একে শ্যালক, তায় অনেকদিন দু'জনে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত ছিল না। এখন একবার যদি ভাব হ'ল তো আর ওকে চোখের আড়াল করতে মন সরছিল না। রসময় এক প্রকার নিঃসঙ্গই দিন কাটায়। তার সঙ্গী বলতে কেউ নেই। সুদাম কোম্পানীর সঙ্গে বয়সের এবং মনের এতটা তফাত যে ওদের ঠিক সঙ্গী বলা চলে না। নিতান্ত রসময় বলেই এখানে ওরা অতটা প্রশ্রয় পায়। অন্য কেউ হ'লে কখনই পেত না। এখানে যদি গৌরহরি আসে কি আনন্দই না হয়! দু'জনে সমবয়সী, তাতে ছেলেবেলার বন্ধু। গৌরহরি মামার বাড়ি এলে দিনরাত ওর কাছেই কাটাত। অমন তাম্রকূট সেবনের গোপনীয় স্থান সারা গাঁয়ে আর তো কোথাও ছিল না। আবার দু'জনে বাকি জীবনটা যদি ছেলেবেলাকার মতো তেমনি পরমানন্দে কাটিয়ে দিতে পারে, তো তার চেয়ে লোভনীয় আর কি হ'তে পারে! সেই সম্ভাবনার আনন্দে রসময় পুলকিত হয়ে উঠল।

গৌরহরির জায়গাটা পাওয়া সম্বন্ধে মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিল! জিজ্ঞাসা করলে, জায়গাটা পাওয়া যাবে তো হে?

—নিশ্চয়।

রসময়ের মনে মনে যা ইচ্ছা হয়, সে সম্বন্ধে তার আর কোনো সন্দেহ থাকে না। তারপরে সে আশা সফল হোক, আর নাই হোক। এ সম্বন্ধে সে, যাকে বলে, অতিরিক্ত আশাবাদী।

তার অতখানি ভরসায় গৌরহরি যথোচিত আশান্বিত হ'ল। বললে, তা যদি হয়···

—আরে বাপু, নাই যদি হয়, আমার আখড়া তো আছে। এইখানেই না হয় দু'জনে থাকা যাবে।

গৌরহরির মনোগত অভিপ্রায় কিন্তু অন্য রকম। সে নিজের একটি বাসা বাঁধতে চায়। সম্ভব হ'লে বিনোদিনাকে নিয়ে, না হ'লে তার কাছাকাছি। বিনোদিনীর যাবার আর স্থানই বা কোথায়? কমলপুর ফেরার পথ নেই। পিত্রালয়ের দ্বারও বন্ধ। ওর মা কাঁদলে কি হবে? দাদাকে নোয়ান খুবই কঠিন, অসম্ভব বললেই চলে। সে কথা সে ভালো করেই জানে। বিবাহের পর থেকেই বিনোদিনী ওকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলছে এ সত্যি। কিন্তু নারীর মন, একদিন যখন দয়া করেছিল, তখন আবার সদয় হতেই বা কতক্ষণ! গৌরহরির দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, সে যদি ওর সান্নিধ্যে থাকতে পায়, ওকে জয় করা শক্ত হ'তে পারে, কিন্তু অসম্ভব হবে না। আজ হোক, কাল হোক, প্রসন্ন ওকে একদিন হতেই হবে। কেনই বা হবে না? আর কোন অবলম্বনই বা ওর রইল? সেই ভরসা নিয়েই এতদূর ও এসেছে। সেই ভরসাতেই রসময়ের আখড়ার পাশে আখড়া তৈরীর অভিলাষ। রসময়ের আখড়ার পাশে। যার ও এতদিন মুখ পর্যন্ত দেখতে চায়নি। যে বোনের নাম পর্যন্ত ও শুনতে চাইত না। তারই আখড়ার পাশে! এতদূর যে ও নেমেছে, সে কিসের ভরসায়?

একটু দ্বিধাভরে বললে, তাও হয়। তবে কি না ও জায়গাটা যদি পাওয়া যায় তাহ'লে আর কথাই নেই।

রসময় একটু বিবেচনা ক'রে বললে, পাওয়া যাবার আশা তো ষোলো আনা। তবে এখন···

—সে তো নিশ্চয়। —গৌরহরি হেসে বললে, ললিতা বলছিল, আমাদের সেই পুরোন আখড়াতেই···

—না, না। তার চেয়ে এ জায়গা ঢের ভালো।

রসময় অনেক দিন পরে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে ওকে পেয়েছে। আর ছাড়তে রাজী নয়।

খুশী হয়ে গৌরহরি বললে, আমিও তাই বলছিলাম। সেখানে আর কিসের মমতায় থাকা। এক ছিল মা, তিনি তো নেই। এখানে বরং তোমরা আছ। একসঙ্গে মিলেমিশে ··কি বল?

—তার আর কথা!

একটু চিন্তা ক'রে গৌরহরি বললে, একখানা তো দু'চালা ঘর। ভিক্কেসিক্কে ক'রে খুব হয়ে যাবে। কি বল?

—নিশ্চয়।

আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে গৌরহরি বললে, তাই বলছিলাম।

রসময় হুঁকোটা এগিয়ে দিলে। চোখ বুজে হুঁকোয় দু'টো টান দিয়ে গৌরহরি আবার বললে, দু' সন্ধ্যে ময়ূরাক্ষীর জলে স্নান, আর রাধাকৃষ্ণের নাম। কি বল?

গৌরহরি খুব উৎসাহের সঙ্গে হাসলে।

রসময় বললে, তার আর কথা! স্রোতের জলে স্নান করলে দেহ মন পবিত্র হয়।

গৌরহরি সম্ভবতঃ স্রোতের জলের কথাটা নিবিষ্টমনে চিন্তা করতে লাগল।

রসময় বললে, বাঁশ-খড়ের জন্যে ভাবতে হবে না। সে আমি এক দিনে যোগাড় ক'রে দোব। বাকি দেওয়াল। টাকা বিশ-পঁচিশ বড় জোর খরচ হবে।

চিন্তিতভাবে গৌরহরি বললে, তাহ'লে?

—আর কপাট-চৌকাঠ। ধর টাকা পাঁচেক।

—তবে?

গৌরহরি রীতিমত দ'মে গেল।

—আর তোমার ঘর লেপা, উঠান পরিষ্কার, ওগুলো আমরাই পারব। কেবল চাল ছাওয়ার বারুই খরচ। সেও ধর টাকা পাঁচেকের কম নয়।

—তাহ'লে ?

নৈরাশ্যে গৌরহরির মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

উৎসাহের সঙ্গে ওর পিঠ চাপড়ে রসময় বললে, রাধারানীর কৃপায় কিছু আটকাবে না হে। আমি যখন আছি তখন আখড়া তোমার এক রকমে হয়ে যাবেই।

—তাই বল। আমার কাছে কিন্তু একটি তামাও নেই।

—তা না থাক হে! আমি তো আছি!

—তা তো আছ। কিন্তু তোমার যা মুরোদ তাও তো জানি।

রসময় এবং গৌরহরি দু'জনেই চমকে উঠল। বিনোদিনী যে কখন এসে অন্ধকারে এককোণে চুপ ক'রে বসেছে, গল্পের ফাঁকে ওরা তা লক্ষ্য করেনি। ওর উপস্থিতিতে গৌরহরি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কিন্তু রসময় বললে, তুমি মনে কর কি! আমার এই আখড়াটা তৈরি করতে ক'শো টাকা খরচ হয়েছে শুনি? একটি আধলা না।

বিদ্রূপ ক'রে বিনোদিনী বললে, বল কি!

—হ্যাঁ গো। বিশ্বাস না হয়, তারও তো সাক্ষী আছে। জিগ্যেস ক'রে দেখতে পার। শুধু দাঁড়িয়ে থেকে খালাস।

বিনোদিনী মাথা দুলিয়ে বললে, সে গ্রামে একঘর বৈষ্ণব বসাবার জন্যে একবার না হয় কোনো রকমে দিয়েছে। তাই ব'লে বারে-বারে দেবে?

—আলবত দেবে।

উত্তেজিতভাবে রসময় দুই হাতে তালি বাজালে।

—দেবে! ওরা তো আর ক্ষেপেনি। ওদের ঘর-সংসার করবারও ইচ্ছে নেই।

গণ্ডগোল শুনে ললিতাও আধঘোমটা দিয়ে এক পাশে এসে দাঁড়াল। বিনোদিনীর আপত্তি ওর ভালো লাগছিল না, বিশেষতঃ ওর নিজের দাদার সম্বন্ধে।

ফিসফিস ক'রে বললে, দেবে কি না দেবে তুই জানিস ?

—জানি। আর তোরাই বা বারেবারে চাইবি কোন লজ্জায় ?

হাত উলটে রসময় বললে, তার আর লজ্জা কি! গেরস্ত না দিলে আমাদের আর কে দেবে ?

—হুঁ।

বিনোদিনী চুপ ক'রে ব'সে রইল।

রসময় গৌরহরিকে বললে, তুমি কিছু ভেব না হে! সে যা করতে হয় আমি ক'রে দোব।

কিন্তু গৌরহরি আর যেন তেমন উৎসাহিত বোধ করলে না। নিঃশব্দে ব'সে রইল।

তার পরদিন নিরিবিলি পেয়ে বিনোদিনী ওকে আড়ালে ডাকলে। সে কাল থেকেই তক্কে তক্কে ছিল। অকস্মাৎ সুযোগ মিলতেই ডাকলে। আশায়, আশঙ্কায় এবং অজানিত আনন্দে গৌরহরির বুক দ্রুত তালে বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বললে, আমাকে ডাকছ ?

অর্থাৎ গৌরহরি বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, বিনোদিনী এমন নিরিবিলি হাত ইসারায় তাকে ডাকতে পারে।

বিনোদিনী বললে, হ্যাঁ। তুমি কি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাও ?

গৌরহরি চমকে উঠল। ব্যথায় ওর মুখ মলিন হয়ে উঠল। বিস্মিত আর্তকণ্ঠে বললে, ও-কথা মনে করছ কেন ?

—না তো কি! এত জায়গা থাকতে তোমার এখানেই আখড়া করার দরকার পড়ল ? কিন্তু আমিও ব'লে রাখছি, যেদিন তুমি এখানে আখড়া তৈরি করবে সেইদিনই যে দিকে দুই চোখ যায় সেই দিকে চ'লে যাব।

রাগে বিনোদিনীর নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছিল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল চীৎকার ক'রে ওঠে। দাঁতে দাঁতে চেপে সে কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে গৌরহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বেশ, তাই হবে।

ভিতর থেকে তার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। ব'লে গেল, রসময় কি ললিতা ফিরলে ব'ল বিশেষ দরকারে আমাকে যেতে হচ্ছে, তারা যেন দুঃখ না করে।

বিনোদিনী কিছুই না ব'লে দাঁড়িয়ে রইল। গৌরহরি যে এত শীঘ্র চ'লে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। তার অকস্মাৎ ভয় হ'ল, রসময়-ললিতা কি মনে করবে! সে চোরের মতো সন্তর্পণে গিয়ে ঢেঁকিশালে ঢুকল।

ললিতা অত খোঁজ করলে না। ভাবলে, দাদা কোথায় বেড়াতে গেছে। কিন্তু রসময় এসেই হৈ হৈ আরম্ভ করলে। আমবাগানের জায়গাটাই পাওয়া গেছে, চাওয়া মাত্রই।

—কোথায় গেলে হে! গৌরহরি!

ললিতা বেরিয়ে এসে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলে, জায়গাটা পাওয়া গেল?

—যাবে না? বলিনি তোমাদের, আমি চাইলে গিন্নিমা কখ্‌খনো না বলবেন না? কিন্তু সে গেল কোথায়? গৌরহরি?

—তোমার সঙ্গে যায়নি?

—নাঃ! আমার সঙ্গে আবার কোথায় যাবে?

—আমি তো ভেবেছিলাম···ও বিনোদিনী!

বিনোদিনী ঢেঁকিশাল থেকে গম্ভীরকণ্ঠে সাড়া দিলে, জানি না।

॥ দশ ॥

শারদীয়া ষষ্ঠী।

ভোর থেকেই পূজা বাড়িতে বাড়িতে বিবিধ সুরে নহবতের আলাপ আরম্ভ হয়েছে। দুর্গাঘরের সম্মুখের প্রশস্ত উঠানে অত ভোর থেকেই ছেলেদেরও মাতামাতি লেগেছে। একদল এনেছে কোথা থেকে রাশি-প্রমাণ আমের শাখা ভেঙে। খড়ের দড়িতে গেঁথে উঠানের চারিদিকে এমনকি পথের অনেক দূর পর্যন্তও টাঙান হবে। গেলবারে ও-পাড়ার দল নাচতে নাচতে এসে লাঠি দিয়ে শাখা ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল। এবারে লাঠিতে যাতে নাগাল না পায় এমন উঁচুতে টাঙানর ব্যবস্থা হচ্ছে। কেউ কলাগাছ এনে সিঁড়ির দু'ধারে বসাচ্ছে। এরা অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের দল। নিতান্ত ছোটদের নেচে কুঁদে বেড়ান ছাড়া কাজ নেই, সকলেরই পরনে রঙিন কাপড়। কারও বাসন্তী, কারও লাল, কারও নীল, কারও বেগুনি, কারও বা আবার বিচিত্র বর্ণের। কারও গায়ে ছিটের জামা আছে, কারও তাও নেই। মেয়েরা কেউ ছোট ভাইটিকে কোলে ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছে। ওদের খেলার আনন্দ যেন তাদের মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে। থেকে থেকে উঠছে হেসে। কেউ কেউ বা নিজেরাই খেলায় মেতে গেছে। তাদেরও পরনে রঙ-বেরঙের শাড়ী। মাতব্বর ব্যক্তিরা হুঁকো হাতে কোমরে কাপড় বেঁধে ব্যস্তভাবে সকল কাজ তদারক ক'রে বেড়াচ্ছে। কাকেও আবশ্যক, কাকেও আবশ্যকের অতিরিক্ত, কাকেও বা অনাবশ্যক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। দুষ্টু ছেলেদের দিচ্ছে ধমক,

কখনও বিনা দোষে, কখনও বা দোষের জন্যে। এ ছাড়া অনেক গুরুতর বিষয়ে মতানৈক্যের জন্যে কলহও বেধে যাচ্ছে। কেউ কলাগাছটা এখানে বসাতে বলছে, কেউ ওখানে। কেউ বলছে প্রতিমা ঠিক বসান হয়নি, কেউ বলছে হয়েছে। কেউ ঢাক বাজাতে বলছে, কেউ থামাতে। এমনি কলরবানন্দে পূজাবাড়ি সরগরম। আনন্দ যেন উপচে পড়ছে।

কেবল বিনোদিনী সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে ব'সে আছে। দু'চারগাছি রুখ্ চুল ললাটে, চোখের উপর অকারণে উড়ছে। মুখ শুকনো। ললিতা রান্নাঘরে কি যেন টুকিটাকি করছে। পূজাবাড়ির শানাইএর সুর এতদূরে ভেসে আসছে। তারই সঙ্গে বহু কণ্ঠের কলরবের ক্ষীণ সুর। কত হাসি, কত গান, কত উল্লাস। যারই সঙ্গে দেখা, তারই মুখে হাসি যেন ধরে না, কথা যেন ফুরায় না, প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতির উৎস যেন অফুরন্ত হয়ে উঠেছে।

বিনোদিনীর মন ভালো নেই। ললিতার মুখের মেঘভার এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। কেবল রসময় যথাপূর্বং তথা পরম্। ললিতার মন ভালো নেই দাদার জন্যে। এতদিন সে ছিল না, আসেনি, মুখের কথা পর্যন্ত কয়নি, সে ছিল ভালো। এখন দেখে আর ছাড়বার ইচ্ছা ছিল না, বিনোদিনী কিছু না বলুক, তার বুঝতে বাকি নেই যে গৌরহরির আকস্মিক অন্তর্ধানের মূল কারণ বিনোদিনী। সাক্ষাৎভাবে যদি নাও হয়, পরোক্ষভাবে নিশ্চয়ই। রসময়ের জন্যে এ নিয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারেনি বটে, কিন্তু মন ওর বিনোদিনীর প্রতি প্রসন্ন হ'ল না। সেই অপ্রসন্নতা বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়াল না। সেও প্রকাশ্যভাবে কিছু বললে না বটে, কিন্তু মনে মনে মুষড়ে গেল। অনুতপ্ত হ'ল। নিজের প্রতি রাগও হ'ল। গৌরহরিকে এখান থেকে তাড়াবার কোনো অধিকারই তার নেই। ভাই এসে থাকতে চায় বোনের আখড়ার কাছে, এ বিষয়ে তার আপত্তি অন্যায় এবং অসঙ্গত। তার অসুবিধা হ'লে সে নিজেই চ'লে যেতে পারত। আর অসুবিধাই

বা কি? কই কালীশঙ্করের জন্যে সে তো এখান ছেড়ে পালাল না। গৌরহরিকেই বা এমন কি ভয়! সে অন্ততঃ কালীশঙ্করের চেয়ে ভালো।

কিন্তু মনে মনে ভয় ওর যেন আছে। কালীশঙ্কর আর গৌরহরির মধ্যে কোথায় যেন পার্থক্য আছে। এখান ছেড়ে যেতেও তার ভয় করে। এমন নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর কোথায় সে পেতে পারে? গৃহস্থের সংসার তো তার অপরিচিত নয়। ছোট হিংসা, ছোট স্বার্থ নিয়ে কলহ সেখানে দিনরাত্রি বেধেই আছে। শান্তি একতিল নেই। তার তুলনায় এ তো স্বর্গ। এ স্বর্গ ছেড়ে আর এক স্বর্গে যাওয়া ছাড়া আর কোনো স্থান সে কল্পনাতেও আনতে পারে না। আর যাওয়ার ঠাঁইও নেই। বিনোদিনী করেই বা কি!

ক'দিন থেকে তার ঢেঁকিশাল বন্ধ। যাদের সে নিয়মিত চাল দেয়, তাদের একেবারে এমন পরিমাণ চাল দিয়ে রেখেছে, যাতে অন্ততঃ লক্ষ্মী পুজোর আগে আর ঢেঁকিযন্ত্র চালনার প্রয়োজন হবে না। তাই বিভিন্ন চিন্তায় তার কর্মহীন মুহূর্তগুলো ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে! তার মন কেবলই বলছে, এবার যেতে হয়েছে। ভাঙতে হয়েছে এখানকার বাসা। ললিতার অপ্রসন্নতা তার অতি-অভিমানী চিত্তে যেন অহরহ কাঁটার মতো বিঁধছে। তারই জ্বালায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। রাত্রের নিদ্রা পর্যন্ত বন্ধ।

রসময় কোথায় ছিল, ব্যস্তভাবে এসে বললে, কই গো বিনোদিদি, আমার নতুন বহির্বাসটা দাও তো। পুজোর দিনে আর পুরোনোটা পরতে পারছি না।

ললিতাকে না চেয়ে রসময় বিনোদিনীকেই চাইলে। উদ্দেশ্যটা বোধ হয় এই যে, শুভদিনে দাত্রীর নিজের হাত থেকে জিনিসটা নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু বিনোদিনী নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে রইল। বড় বড় চোখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, আমি তো জানি না কোথায় আছে।

—ঘরেই আছে। আবার কোথায় থাকবে ?

—তাহ'লে ললিতাকে বল।

বিনোদিনী আবার নিজের চিন্তায় মন দিলে।

রসময় এতক্ষণ ওর দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার ব'ল তো! তোমাদের কি ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

ললিতা সহজভাবে বললে, না। ঝগড়া হবে কেন ?

—তবে ? পুজোর দিনে তুমি ওখানে চুপ ক'রে ব'সে, ইনি এখানে গালে হাত দিয়ে ব'সে! কি ব্যাপার!

ললিতা এবারে হেসে বললে, তবে কি শুধু হাসতে হবে নাকি ?

মাথা নেড়ে রসময় বললে, আমার আখড়ার তাই তো দস্তুর। রাধারানীর আখড়ায় তো মুখভার চলবে না।

ললিতা জোরে জোরে হেসে বললে, তবে আয় লো, রান্নাবাড়া বন্ধ রেখে দু'জনে উঠানে ব'সে খুব খানিক হাসা যাক।

রসময় আর কিছু বললে না। সে বুঝলে ওরা যে চুপ ক'রে ব'সে আছে, সে এমনিই। এর মধ্যে রাগ-রোগের কোনো কারণ নেই। অনেকটা সে নিশ্চিন্ত হ'ল। গুরু তাকে বলেছেন আনন্দে থাকতে। সেই আনন্দে কোথাও বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা দেখলে জল-ছাড়া মাছের মতো সে হাঁপিয়ে ওঠে। একেবারে বিব্রত হয়ে যায়।

ললিতার কথায় খুশী হয়ে সে ঘর থেকে নতুন বহির্বাসটা নিয়ে এসে পরলে। বিনোদিনীর সামনে একটা ঘুরপাক দিয়ে বললে, কি রকম লাগছে বিনোদিদি ?

বিনোদিনী ওর ঘুরপাক দেওয়া দেখে হেসে ফেললে। বললে, চমৎকার লাগছে। ঠিক রাজপুত্রের মতো!

রসময় চোখের ইঙ্গিতে ললিতাকে বললে, শোন। যারা আসল সমঝদার, তাদের কথাটা শোন। তুমি তো কিছুতেই মানতে চাইবে না।

ললিতা মুখ টিপে হেসে বললে, তা বটে। কিন্তু রাজপুত্রের মতো চেহারা হ'লে তো চলবে না।

—কেন? অসুবিধা কি?

—ভিক্ষে মিলবে না।

কৃত্রিম বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠে রসময় বললে, বাস্তবিক! ও বিনোদিদি! শুনছ?

—শুনছি।

—কি করা যায় তাহ'লে? এ বহির্বাস তো চলবে না।

বিনোদিনী নিশ্চিন্তভাবে বললে, তবে ছেড়ে রেখে দাও।

রসময় আবার বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললে। বললে, আশ্চর্য মেয়ে তুমি বিনোদিদি! সখ ক'রে দিলে বহির্বাস, এখন বলছ ছেড়ে রাখতে? বিলক্ষণ!

অপ্রস্তুতভাবে হেসে বিনোদিনী বললে, তা নইলে যে ভিক্ষে মিলবে না বলছে।

—না হয় তুমিই দু'টি দু'টি ক'রে রোজ দিতে! পারতে না? মোটের ওপর তোমার অবস্থা তো ভালোই।

—হ্যাঁ, খুব ভালো! ক্ষেত খামার, জোত জমি···

—আহা, জোত জমি নিয়ে তুমি মেয়েমানুষ করবে কি! এ যে তার চেয়ে ঢের ভালো। জমিজমার হাঙ্গাম তো সোজা নয়। আর এ,—ধান কিনলে, চাল করলে, বিক্রি হ'ল,—ফুরিয়ে গেল।

বিনোদিনী হেসে ফেললে। বললে, তাই তো! একদিন চাল ক'রে দাও না! দেখি কেমন বেটাছেলে!

—পারি না মনে করছ?

—দেখিয়ে দিলেই বুঝি।

ওদের তর্ক ক্রমেই জ'মে উঠছে দেখে ললিতা বললে, আজ ভিক্ষেয় বেরুবে না নাকি?

—ভালো কথা মনে পাড়িয়ে দিয়েছ। এখনি হয়েছিল আর কি?

—বলেই তখনি বললে, পুজোর এ ক'দিন থাক বরং। ঘরে কি চাল একেবারেই বাড়ন্ত নাকি?

ললিতা বললে, চ'লে যাবে কোনো রকমে।

—তবে থাক।

রসময় বহির্বাস ঘরে খুলে রেখে এসে এক কলকে তামাক সেজে নিশ্চিন্তভাবে নিমতলার বেদীর উপর গিয়ে বসল। ললিতার গৃহকর্ম হয়ে গিয়েছিল। একটা ঘড়া নিয়ে নদীর ঘাটে নাইতে গেল।

তামাক খেতে খেতে রসময় বললে, ইস্কুলের ছেলেগুলো কিন্তু আখড়াটিকে বেশ জমিয়ে রাখে।

বিনোদিনী অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল। সংক্ষেপে বললে, হ্যাঁ।

—বাড়িটা কেমন ফাঁকা ঠেকছে। না?

—হুঁ।

রসময় একটু হেসে আবার বললে, তামাকের খরচ অবিশ্যি একটু বেশী হয় বটে, কিন্তু ওরা না থাকলেও মানায় না।

বিনোদিনী এবার আর উত্তর দিলে না।

—তুমি অত কি ভাবছ বল তো?

বিনোদিনী ভাসা ভাসা দৃষ্টি মেলে চাইলে। একটু পরে বললে, তোমার গৌরহরিকে আমিই তাড়িয়েছি, জান?

—জানি বৈ কি! তা কি হয়েছে কি?

বিনোদিনী কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ললিতাকে দেখে থেমে গিয়ে শুধু বললে, তাই বলছিলাম।

আর কোনো কথা হ'ল না।

∴

স্নান সেরে বিনোদিনী এসে রান্না চড়ালে।

মাথার ভিজে চুল ঘোমটার পাশ দিয়ে পিঠের উপর এসে পড়েছে। তাতে একটা গেরো দেওয়া। পুজোর এ ক'দিন সে প্রত্যহই রাঁধবে

স্থির করেছে। ওরই মধ্যে একটু ভালো রান্না। গৃহস্থাশ্রমের কোনো সংস্কারই সে এখানে এসেও ছাড়তে পারেনি। এটুকুও না। হ'লই বা এটা আখড়া, কিন্তু সে তো গৃহী। তার ধর্ম সে ছাড়বে কেন? একটা ডাল হবে, ভাজা হবে, একটা তরকারিও হবে। এমনকি, মাছ বিক্রি করতে এলে আধকাঠা-চালের মাছ নেবার সঙ্কল্পও মনে মনে আছে। বচ্ছরকার দিনে একটু আঁশ-মুখ না করলে স্বামীর অকল্যাণ হবে। এতগুলো রান্নার সঙ্কল্প নিয়ে বিনোদিনী বেশ ঘটা করেই রান্নাঘরে বসেছে। উনানে ডাল ফুটছে। সে ভাজার জন্যে বেগুন কোটা শেষ ক'রে তরকারির আনাজ কুটতে আরম্ভ করলে।

ওদিকে বসেছে ললিতা। তারও আজকের দিনে একটুখানি বিশেষ রান্নার আয়োজন আছে। হাঁড়িতে ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ উঠছে খুব। ঘটা-পটা তারও কম নয়। অধিকন্তু ব্যস্ততা বেশী। মাথার কাপড় বারেবারেই পিঠের উপর খ'সে খ'সে পড়ছে আর একটা আশ্চর্য কৌশলে আলগোছে তা মাথার মাঝখানে পর্যন্ত তখনই তুলে দিচ্ছে।

ব্যস্ততা নেই কেবল রসময়ের। হুঁকোটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে সে একটা মাদুরের উপর এলিয়ে পড়েছে। মুখে গুনগুন ক'রে কি একটা গান গাইছে, আর আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে মাটির উপর বাজনার তাল দিচ্ছে।

অকস্মাৎ সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ধড়মড় ক'রে বেদী থেকে নেমে সসম্ভ্রমে বললে, আসুন, আসুন।

ওর এই সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনায় রান্না করতে করতে বিনোদিনী এবং ললিতা দু'জনেই চমকে উঠল। এখন আবার কোথা থেকে মাননীয় অতিথির আবির্ভাব হ'ল?

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দু'জনেই উঠানে কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

একখানা আধময়লা মোটা থান কাপড় প'রে বিনোদিনীর মা তখন উঠানের অনেকখানি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তার পাশে বিনোদিনীর

দাদা নিতাইপদ। তারও পরনে আধময়লা একটা ছোট ধুতি হাঁটুর নীচে পর্যন্ত কোনো রকমে নেমেছে। গায়ে চওড়া কালো ডোরা-টানা একটা কোট। সেটার হাত যেমন ছোট, ঝুল তেমনি বড়। আর তার ফাঁক দিয়ে গলার তুলসীর মালা দেখা যাচ্ছে। আর ওদের তুই পাশে—সামনে, পিছনে এক পাল কৌতূহলী ছেলে। এরাই পথ দেখিয়ে এনেছে।

মেয়েকে দেখে বিনোদিনীর মা-ও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার শুষ্ক শীর্ণ দেহ ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। এবং কেউ কোনো কিছু উপলব্ধি করবার পূর্বেই মাটিতে আছাড় খেয়ে প'ড়ে এমন মড়া-কান্না জুড়ে দিলে যে নিতাইপদ পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের ঈদৃশ ভাবান্তরের জন্যে সেও বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না।

ব্যস্ত হয়ে উঠল রসময়। সে প্রথমে বুঝতেই পারেনি এরা কে, কেন এসেছে, পরের বাড়িতে এসে অমন মড়া-কান্না কাঁদবারই বা আবশ্যকতা কি। এদের সে কখনও দেখেনি, চেনেও না। কিন্তু বিনোদিনীর পাথরের মতো মূর্তি, সজল চক্ষু এবং বেপথুমতী দেহলতা দেখে বুঝতে বিলম্বও হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি দাওয়ায় একটা মাতুর পেতে ওদের উপরে আসবার জন্যে বারেবারে অনুরোধ করতে লাগল।

কিন্তু বিনোদিনীর মায়ের কান্না আপনা থেকে ঝিমিয়ে না আসা পর্যন্ত ওর অনুরোধে কোনো ফলোদয় হ'ল না। আর ঝিমিয়ে যখন এল তখন প্রতিবেশী এবং প্রতিবেশিনীর ভিড়ে উঠানে আর তিল ধরার ঠাঁই নেই। তারা অবাক হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মা অপরিচিত জনতার কাছে বিনোদিনী সংক্রান্ত সব কথাই খুলে বললে। বিনোদিনী তখন মর্মান্তিক লজ্জায় ঘরে ঢুকে মৃত্যু-কামনা করছে। লজ্জা পেয়ে নিতাইপদও ওর মায়ের হাত ধ'রে টানাটানি আরম্ভ করলে। কিন্তু মা সেকালের সরল লোক। লজ্জাও বোধ করলে না, ছেলের উদ্দেশ্যও বুঝতে পারলে না। যেটুকু সে প্রকাশ করতে চায় না, জনতার জেরায় তাও গোপন রাখতে

পারলে না। অবশেষে নিতাইপদ এক প্রকার জোর করেই তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

জনতা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে নানা মন্তব্য করতে করতে হতাশভাবে একে একে ফিরে গেল।

অতিথিরা তখন হাত মুখ ধুয়ে সুস্থ হয়েছে। তারাপদর জন্যে যে হুঁকো আনা হয়েছিল তাইতে জল ফিরিয়ে নিতাইপদকে রসময় তামাকও দিয়েছে। কিন্তু নিতাইপদর চলাফেরা, কথাবার্তা এমন রুক্ষ ধরনের যে, রসময় কিংবা ললিতা কেউই একটা কথা পর্যন্ত কইতে সাহস করছে না। কুশল প্রশ্নও না।

নিতাইপদ নিবিষ্টমনে কিছুক্ষণ তামাক খেয়ে গেল। এবং এই সমাদরের প্রত্যুত্তরে সে নিজেও ওদের একটা কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত করার প্রয়োজন অনুভব করলে না। কিছুক্ষণ পরে তামাক টেনে শ্রান্ত হয়ে হুঁকোটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে দিলে। একবার মায়ের দিকে চাইলে। এতক্ষণ পরে মা লজ্জা পেল কি না জানি না, কিন্তু সমস্ত মুখ সে ঘোমটায় ঢেকে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে বসেছে। কান্নায় তার দেহ তখনও থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নিতাইপদ যেন বাতাসকে শুনিয়ে রুক্ষ মেজাজে বললে, আর ঘরে ব'সে থেকে কি হবে? বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি আছে গোছগাছ ক'রে নে। এখুনি বেরুতে হবে।

কথাটা বলা হ'ল বিনোদিনীকে। সে সেই-যে ঘরে ঢুকেছে আর বের হয়নি।

রসময় ব্যস্ত হয়ে বললে, এখুনি? তা কি হয়! বরং রান্না চড়েছে। কিছু খেয়ে-দেয়ে বিকেল বেলায়।

—না।

একটিমাত্র শব্দ। কিন্তু এমনি অভদ্র, পরুষ, কর্কশকণ্ঠ রসময় জীবনে শোনেনি। সে নিরীহ মানুষ। আর দ্বিতীয় কথাটি কইলে না।

ললিতা নিতাইপদকে ভালো ক'রেই চেনে। সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গেল। বিস্মিত হয়ে দেখলে, বিনোদিনী মেঝেয় লুটিয়ে প'ড়ে ছেলেমানুষের মতো অঝোরে কাঁদছে! এতদিন পরে এই প্রথম বিনোদিনীকে সে কাঁদতে দেখলে, এবং এমনি ক'রে কাঁদতে। ও হয়তো বুঝতেই পারলে না যে, বাইরে বিনোদিনীকে যত শক্তই দেখাক, ভিতরে ভিতরে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ওর বিস্ময়, যে-মেয়ে কখনও কাঁদে না, কিছুতে কাঁদে না, তাকে কাঁদতে দেখে। সেই সঙ্গে ওরও চোখে দু' ফোঁটা জল। বিনোদিনীর শিয়রে ব'সে ওর মাথায় স্নেহতপ্ত করতল রেখে নিঃশব্দে বসল।

চুপিচুপি বললে, এখুনি নিয়ে যেতে চাইছে যে!

আরও একটু চুপ করে প'ড়ে থেকে বিনোদিনী ধীরে ধীরে উঠে বসল। তখনও দু' ফোঁটা অশ্রু ওর চোখের কোণে টুলটুল করছে। দৃষ্টি আকাশের মতো শূন্য।

বললে, এখুনি?

—কি বলব?

—কিছু বলতে হবে না! তবে খেয়ে-দেয়ে গেলেই ভালো হ'ত। আমার জন্যে নয়, কিন্তু মা বুড়োমানুষ।

ললিতা হঠাৎ ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে চেপে ধ'রে বললে, তুই কি সত্যি সত্যিই যাবি নাকি?

বিনোদিনী কথা বললে না। শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, যাবে!

একটু পরে বললে, তোর দাদাকে আমি তাড়িয়েছি ললিতা। সে রাগ রাখিস না। আবার ধ'রে এনে এখানেই একটা আখড়া ক'রে দিস।

তাড়াতাড়ি ললিতা বললে, তুই কি সেই জন্যেই যাচ্ছিস নাকি?

—শুধু সেই জন্যেই নয়। দাদার বাড়িও তো আমার নিজের নয়। তবু মা যতদিন আছে···

ওর গৃহী মনে ললিতার ব্যবহারে লেগেছে প্রচণ্ড আঘাত।

বললে, কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাব না। এখানে যা করেছি, এখানেই থাক। চালের হাঁড়ীতে এককুড়ি পাঁচ টাকা আছে। তা থেকে পাঁচ টাকা শুধু আমাকে এনে দে।

—না, না। আমরা টাকা নিয়ে করব কি?

বিনোদিনী একটু ভেবে বললে, তাও বটে। তাহ'লে সব ক'টাই এনে দে। সব্বের নীচের হাঁড়িতে আছে।

ললিতা রান্নাঘর থেকে টাকা ক'টা এনে দিলে।

বিনোদিনী বললে, আমার যে পুজোর রঙিন শাড়ী, ও তোকেই দিলাম। তুই পরিস।

ও ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওকে দেখেই নিতাইপদ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, এই যে! মা ওঠ।

ব'লে কারও অপেক্ষা না রেখে নিজেই এগিয়ে চলল। পিছনে বিনোদিনী। তার পিছনে মা। বাগানের কাছে গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। নিতাই ওদের গাড়ীতে চড়িয়ে তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছেড়ে দিলে। ললিতা গাড়ীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বিনোদিনী একবার ওর দিকে চাইলে। কিছু বললে না। গাড়ী তখন চলতে লেগেছে। ললিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, গাড়ী ময়ূরাক্ষীর ধার দিয়ে, স্কুলের বোর্ডিঙের পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে প্রচুর ধুলো উড়িয়ে চলল। তার পরে ধীরে ধীরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আখড়ায় ফিরে গেল।